বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

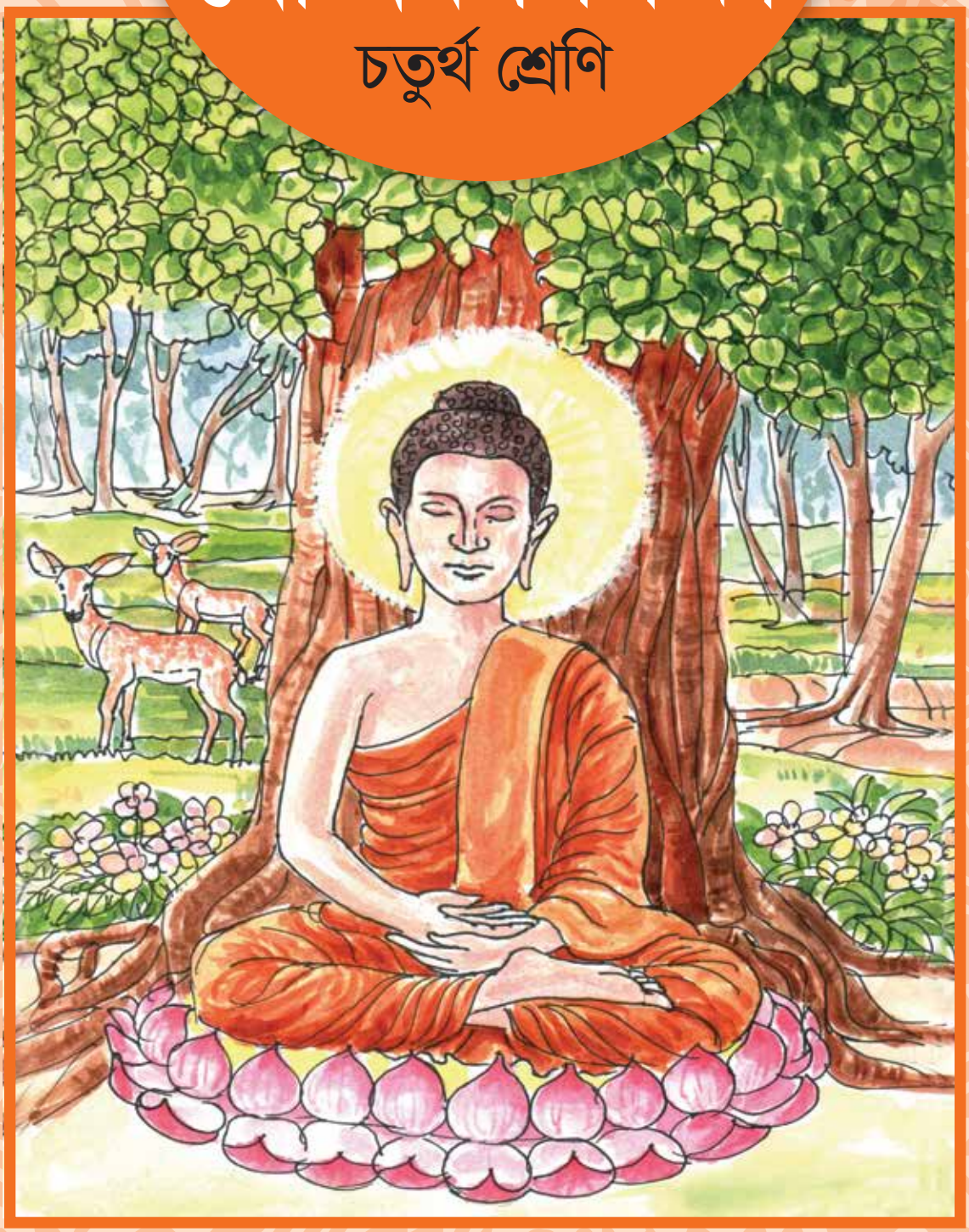

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

ড. শান্টু বড়ুয়া

রিটন কুমার বড়ুয়া

অনুপম বড়ুয়া

শিপ্রা বড়ুয়া

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

মোহা. মোমিনুল হক

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ

মংপু মারমা

তাসনীমা ইসলাম

প্রথম মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা এবং বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর প্রদান করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। অংশীজনের চাহিদা এবং মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সর্বশেষ ২০২৫ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসমূহ ইতোমধ্যে পরিমার্জন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রাথমিক স্তর (পরিমার্জিত ২০২৫)-এর আলোকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যাতে একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক শিশুদের দেহ ও মনের সুষম বিকাশে সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

চতুর্থ শ্রেণির 'বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের সময়ে পূর্ব-শ্রেণির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণিতে সাধারণত নয় বছরের অধিক বয়সের শিশুরা পাঠ গ্রহণ করে। বয়সের কথা বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তকে শিখন বিষয়ের উল্লম্ব ও আনুভূমিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে যেন সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে। চারটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকেই তথ্য ও বর্ণনামূলক রচনাগুলোর ধারাবাহিকতা রয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইংয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন, চূড়ান্তকরণ এবং সমন্বয় কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, চিত্রশিল্পী এবং ইনডিজাইনারসহ যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের জীবন ও সূত্র পিটক	০১-২০
দ্বিতীয় অধ্যায়	আদর্শ জীবনচরিত	২১-৩৩
তৃতীয় অধ্যায়	নীতিশিক্ষা ও কর্ম	৩৪-৫০
চতুর্থ অধ্যায়	পূজা-উৎসব ও ঐতিহাসিক স্থান	৫১-৭১
পঞ্চম অধ্যায়	জাতকে জীব ও প্রকৃতি	৭২-৮৬

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের জীবন ও সূত্র পিটক

প্রথম পরিচ্ছেদ

গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার ও মহাপরিনির্বাণ

এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যা আছে-

- গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার
- পঞ্চবর্গীয় শিষ্য পরিচিতি
- চারি আর্যসত্য
- বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ
- মহাপরিনির্বাণকালে বুদ্ধের উপদেশ

গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার

যতীন বড়ুয়া একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি নিয়মিত উপোসথ পালন করেন। আজও ছিল উপোসথ তিথি। তিনি দুপুরের আহার শেষ করে চেয়ারে বসে জাতকের একটি বই পড়ছেন। এমন সময় তাঁর নাতি সুপ্ত বড়ুয়া স্কুল থেকে ফিরে এলো। সুপ্ত চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। সে ঘরে ঢুকতেই দাদুকে বই হাতে দেখে খুব আনন্দিত হলো। সে সঙ্গে সঙ্গে দাদুকে একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলো। দাদু! বলেন তো, বুদ্ধ কীভাবে ধর্মপ্রচার করেছিলেন? হঠাৎ ছোটো নাতির মুখে এরকম প্রশ্ন শুনে যতীন বাবু নিজেই অবাক হলেন। তিনি নাতিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রশ্ন তুমি কোথায় পেলে? উত্তরে সুপ্ত বলল, আজ স্কুলে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ক্লাসে দিদিমণি এটি জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমরা কত ধরনের বুদ্ধমূর্তি দেখেছি। আমি আমাদের বৌদ্ধ বিহারে আছে এমন দুই ধরনের মূর্তির কথা বলেছি। একটি বসা অবস্থায় ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি, অন্যটি বুদ্ধের পরিনির্বাণ শয্যা মূর্তি। এটি শুনে তিনি বললেন, বুদ্ধের পরিনির্বাণ বলতে ইহজীবনের অবসান বোঝায়। আমরা সবাই বলেছি, হ্যাঁ, তাই। তখন তিনি আমাদের কাছে জানতে চাইলেন, মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধ কি আছে? ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকে এ বিষয়ে কী বলা হয়েছে? এ বিষয়টি আগামীকাল জেনে যেতে বলেছেন। দাদু শুনে হেসে বললেন, দাদু ভাই, তুমি একেবারে ঠিক সময়েই এই প্রশ্নটি নিয়ে এসেছ। আজ উপোসথ উপলক্ষ্যে বিহারের পূজনীয় ভন্তে, তথাগত বুদ্ধের অন্তিম জীবন সম্পর্কে বক্তব্য দেবেন। যেখানে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার ও মহাপরিনির্বাণ ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা হবে। আমরা ভন্তের ভাষণ থেকেই এই প্রশ্নগুলোর সমাধান পেয়ে যাব। তুমি প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে প্রস্তুত হয়ে এসো। যথাসময়ে সুপ্তকে সঙ্গে করে দাদু যতীন বড়ুয়া তাদের বিহারে পৌঁছলেন। সে সময় বিহারের ভন্তেও তাঁর আসনে বসেছেন। তিনি দেশনা শুরু করবেন, এমন সময় সুপ্ত ও তার দাদু ভন্তেকে বন্দনা করে তাদের জানার আগ্রহের বিষয়টি জানালেন। ভন্তে বললেন, আমি বলছি, আপনারা শুনুন।

মহামানব গৌতম বুদ্ধ জগতের আলো। জ্ঞান প্রদীপ। তাঁর জ্ঞানালোকে জগৎ উদ্ভাসিত। ধর্ম ও দর্শনে তাঁর সেই জ্ঞানালোক বিকশিত হয়েছে। এই জ্ঞানতত্ত্ব লাভের জন্য তিনি জন্ম জন্মান্তর ধরে সাধনা করেছেন। শেষ জন্মে তিনি কপিলাবস্তুর শাক্যরাজপুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। সেই জীবনে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রত পালনকালে কঠোর সাধনার পর লাভ করেন পরম সম্বোধি জ্ঞান বুদ্ধত্ব।

চিত্র ১: সারনাথের মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যকে বুদ্ধের ধর্ম-দেশনা

বুদ্ধত্ব লাভের পরে বুদ্ধ তাঁর নবলব্ধ ধর্ম বা নতুন অর্জিত জ্ঞান প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কোথায়, কাকে তিনি এই ধর্ম প্রচার করবেন? এই নবলব্ধ ধর্ম বোঝার মতো মানুষ কোথায় পাবেন, তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর মনে এলো তাঁর বিভিন্ন সময়ের সাধন সঙ্গীদের কথা। তাঁদের উদ্দেশ্য করে তিনি যাত্রা করলেন সারনাথের পথে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি উপস্থিত হলেন সারনাথের ঋষিপত্তন মৃগদাবে। সেখানে তখন অবস্থান করছিলেন তাঁর পাঁচ সাথী। যাঁরা তাঁর সাধনা-ব্রতের সূচনাতে সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা হলেন-কোণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। এই পাঁচজনের কাছেই তিনি তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রথম প্রকাশ করেন। বুদ্ধর ধর্ম দেশনা শুনে তাঁরা দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন।

তাঁরা বুদ্ধের কাছে শিষ্যত্ব প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ তাঁদের দীক্ষা প্রদান করলেন। তাঁরা হলেন বুদ্ধের প্রথম শিষ্য ও দীক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষু। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে পরিচিত। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিয়ে প্রথম ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরাই বুদ্ধের নবলব্ধ ধর্ম চারিদিকে প্রচার করেন।

তথাগত বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচারের স্থান হিসেবে সারনাথের মৃগদাব ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বুদ্ধের প্রদত্ত প্রথম ধর্ম-দেশনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' নামে খ্যাত। এতে বুদ্ধ দেশনা করলেন, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্য সমুৎপাদ, অনিত্য ও অনাত্ম তত্ত্ব ইত্যাদি। এই তত্ত্বসমূহ বুদ্ধ তাঁর বিভিন্ন দেশনায় ব্যাখ্যা করেন। এগুলোর ব্যাখ্যা ত্রিপিটকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মহামানব বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার বা দেশনায় চতুরার্য সত্য তত্ত্বটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয় বিস্তৃতভাবে। চতুরার্য সত্য হলো বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি। এটি তথাগত বুদ্ধের একটি প্রধান তত্ত্ব। যা তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্য ও অন্যান্য শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। সেই সঙ্গে এই সত্য বাস্তবতা উপলব্ধি করে উপকৃত হয় অসংখ্য মানুষ।

মহামানব গৌতম বুদ্ধ তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে ছিলেন একা বনচারী। কিন্তু, বুদ্ধত্ব লাভ করে প্রথম ধর্মপ্রচারের পর তিনি আর একা ছিলেন না। তিনি সবসময় শিষ্যদের নিয়ে থাকতেন। শিষ্যদের নিয়মিত উপদেশ দিতেন। তাদেরকে ধর্মপথে অগ্রসর হতে সহায়তা করতেন। সারনাথ থেকেই তাঁর এই কার্যক্রমের সূচনা। বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিয়ে সারনাথেই প্রথম বর্ষাবাস যাপন করলেন। এ সময়ে শ্রেষ্ঠীপুত্র যশ ও তাঁর চার বন্ধু সংসারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাদের অনুসারী আরও পঞ্চাশজন যুবকও ভিক্ষু হলেন। বুদ্ধ এই ভিক্ষুসংঘকে বর্ষাবাস শেষে বিভিন্ন দিকে গিয়ে সর্বজীবের কল্যাণে তাঁর বাণী প্রচার করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, "চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায বহুজন সুখায, লোকানুকম্পায, অথায হিতায সুখায, দেবমনুস্সানং মা একেন দ্বে অগমিথ, দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদিকল্যাণ, মজ্ঝে কল্যাণং পরিযোসানকল্যাণ।" অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ! বহুজনের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো। দুজন একত্রে গমন করো না। প্রচার করো সেই ধর্ম, যে ধর্মের শুরুতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং শেষে কল্যাণ বার্তা নিহিত। অর্থাৎ, যা দ্বারা শুধু মঙ্গলই হয়। ভালো হয়। অন্য কিছু নয়। বুদ্ধের সেই কল্যাণ বাণী নিয়ে সর্বসত্তার মঙ্গলের জন্য ছড়িয়ে পড়েন মহান বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষুগণ। গ্রামে-গঞ্জে-নগরে সর্বত্র ভিক্ষুগণ চারদিক পরিভ্রমণ শুরু করেন।

চিত্র ২: পিণ্ডাচরণরত ভিক্ষুসংঘ

এ সময় বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নির্দেশনা দিয়ে তিনি উরুবেলার সেনানী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এই যাত্রাপথে তিনি অনেককে তাঁর কল্যাণধর্মে দীক্ষিত করলেন। প্রচার করলেন সাম্য, মৈত্রী, করুণার অমিয় বাণী। বুদ্ধের ধর্ম ও বাণী তৎকালীন ভারতবর্ষে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। জগৎ যেন এক নতুন সত্যকে দর্শন করল। এভাবে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন জগতে বিকশিত হলো।

গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে নিচের ছকটি পূরণ করো–

ধর্ম প্রচারের স্থান	শিষ্যদের নাম	কোন সূত্র দেশনা করেন	কোন পূর্ণিমা তিথি

বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তোমাদের বিহারে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিহারের ভন্তে তোমাকে এ সংবাদটি প্রচার করার দায়িত্ব দিলেন। এখন যাদেরকে তুমি এ প্রতিযোগিতায়

অংশগ্রহণের উপযোগী মনে করো তাদের কাছে সংবাদটি কীভাবে প্রচার করবে? তোমার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা লেখো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

চতুরার্য সত্য

চতুরার্য সত্য মানে চার বা চারি আর্যসত্য। এখানে আর্যসত্য বলতে শ্রেষ্ঠ বা মহৎ সত্যকে বোঝায়। যে সত্য জীবনের জন্য অপরিহার্য। মহামানব গৌতম বুদ্ধ জগৎ ও জীবনের বাস্তবতা জেনে যে সত্যতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন সেটিই হলো আর্যসত্য। এটি তাঁর প্রধান জ্ঞান দর্শন। জীবনে কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি এই সত্যের অনুসন্ধান করেছিলেন। বুদ্ধের প্রচারিত চারি আর্যসত্যসমূহ হলো:

ক) দুঃখ আর্যসত্য

খ) দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য

গ) দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং

ঘ) দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

ক) দুঃখ আর্যসত্য

এটি চতুরার্য সত্যের প্রথম আর্যসত্য। এই সত্যমতে জন্মগ্রহণ করলে দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই দুঃখ হলো মানসিক, শারীরিক ও পারিপার্শ্বিক। এভাবে ব্যক্তির সঙ্গে দুঃখের সম্পর্ক হয় অবিচ্ছেদ্য। এরকম দুঃখ নানারূপ হতে পারে। যে কোনো ইচ্ছা পূরণ না হলেও আমরা দুঃখ পাই। মনের এরূপ আকাঙ্ক্ষাকে তৃষ্ণা বলে। সাধারণ দৃষ্টিতে রোগ, হতাশা, অসন্তুষ্টি ইত্যাদি কষ্ট মানুষের প্রায়ই থাকে। তাই সহজ কথায় জন্ম, বার্ধক্য, অসুস্থতা, মৃত্যু, অপ্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রিয়জন হতে বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি দুঃখের উৎস। তাই দুঃখ আর্যসত্য মানে হলো জগৎ দুঃখময়। এটি বৌদ্ধ দর্শনের প্রথম আর্যসত্য।

খ) দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য

দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য বলতে দুঃখের কারণসমূহকে বোঝায়। অর্থাৎ দুঃখ কারণযুক্ত। দুঃখের কারণ আছে। তাই একেকজনের দুঃখ একেক রকম। কারণ অনুসারেই দুঃখ ভোগ করতে হয়। রোগের কারণ জ্ঞাত হলে যেমন রোগ নিরাময় সম্ভব হয়, তেমনি দুঃখের কারণ জানা গেলে সেই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করাও সম্ভব হয়। এটি দ্বিতীয় আর্যসত্য।

গ) দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য

দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য হলো দুঃখ থেকে পরিত্রাণ। এটি দ্বিতীয় আর্যসত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেহেতু দুঃখের কারণ আছে, সেহেতু এটি নিরোধ বা নিবৃত্তি সম্ভব। কারণ, যেকোনো বিষয়ের উৎপত্তির হেতু বা কারণ অবহিত হলে তার বিনাশ সম্পর্কে জানাও সম্ভব। এটি তৃতীয় আর্যসত্য।

ঘ) দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য

বুদ্ধ প্রদর্শিত চার আর্যসত্যের মধ্যে এটি চতুর্থ ও শেষ আর্যসত্য। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আর্যসত্য হলো উপলব্ধিমূলক। চতুর্থ আর্যসত্য হলো আচরণমূলক। এই আর্যসত্যে দুঃখ নিবৃত্তির পথের নির্দেশনা রয়েছে। এতে দুঃখ নিবৃত্তির বা নিরোধের উপায় বর্ণিত হয়েছে। এই সত্যে আটটি পথের নির্দেশনা রয়েছে। এই পথগুলো সমন্বিতভাবে অনুশীলনীয়। কারণ, আচরণের ক্ষেত্রে এগুলো একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি অন্যটির সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এই আটটি পথকে একত্রে বা সম্মিলিতভাবে 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বা আট আর্যপথ বলা হয়। এই পথ অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ সর্বদুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। চারি আর্যসত্যের মাধ্যমে মহামানব বুদ্ধ এই নির্দেশনা দিয়েছেন।

একক বা জোড়ায় আলোচনা করে মানুষের জীবনে দুঃখ উৎপত্তির কয়েকটি কারণ লেখো। তোমার নিজের কোনো দুঃখ আছে কি? থাকলে এ দুঃখের কারণ লেখো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

চার আর্যসত্যের শেষ স্তর হলো দুঃখ মুক্তির উপায়। বুদ্ধ দুঃখ মুক্তির উপায় হিসেবে আটটি উপায়ের কথা বলেছেন। এ আটটি উপায়কে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। এটি হলো মানুষের সব ধরনের দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের পথ। এ পথকে বুদ্ধ আর্য বা শ্রেষ্ঠ পথ বলে উল্লেখ করেছেন। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি পথ হলো:

১) সম্যক দৃষ্টি
২) সম্যক সংকল্প
৩) সম্যক বাক্য
৪) সম্যক কর্ম
৫) সম্যক জীবিকা বা আজীব
৬) সম্যক প্রচেষ্টা বা ব্যায়াম
৭) সম্যক স্মৃতি, এবং
৮) সম্যক সমাধি।

এগুলো চর্চার মাধ্যমে মানুষের মন ও কর্মের মধ্যে বিশুদ্ধতা আসে। মানুষের মন অত্যন্ত চঞ্চল। সবসময় ভুল ধারণার মধ্যে নিয়োজিত থাকে। সহজে কিছু লাভ করার চেষ্টা করে। এই লাভ করতে গিয়েই সৃষ্টি হয় নানা বিপত্তি। তা সত্ত্বেও মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এমনকি বুঝতে পারে না নিজের ভুল। মানুষের এরূপ মনোভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে মানুষের দুঃখ, কষ্ট ও বিড়ম্বনা। এগুলো হতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো মানুষের মন ও আচরণের পরিবর্তন সাধন করা। এই আটটি পথের নির্দেশনা অনুসরণ করলে জীবনের এই দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি সম্ভব হয়। এই আটটি পথকে পালি ভাষায় বলে 'অরিয অট্ঠঙ্গিক মগ্গ'। যার সরল বাংলা করা যেতে পারে 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বা 'বিশুদ্ধ আটটি পথ'।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা আটটি পথের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

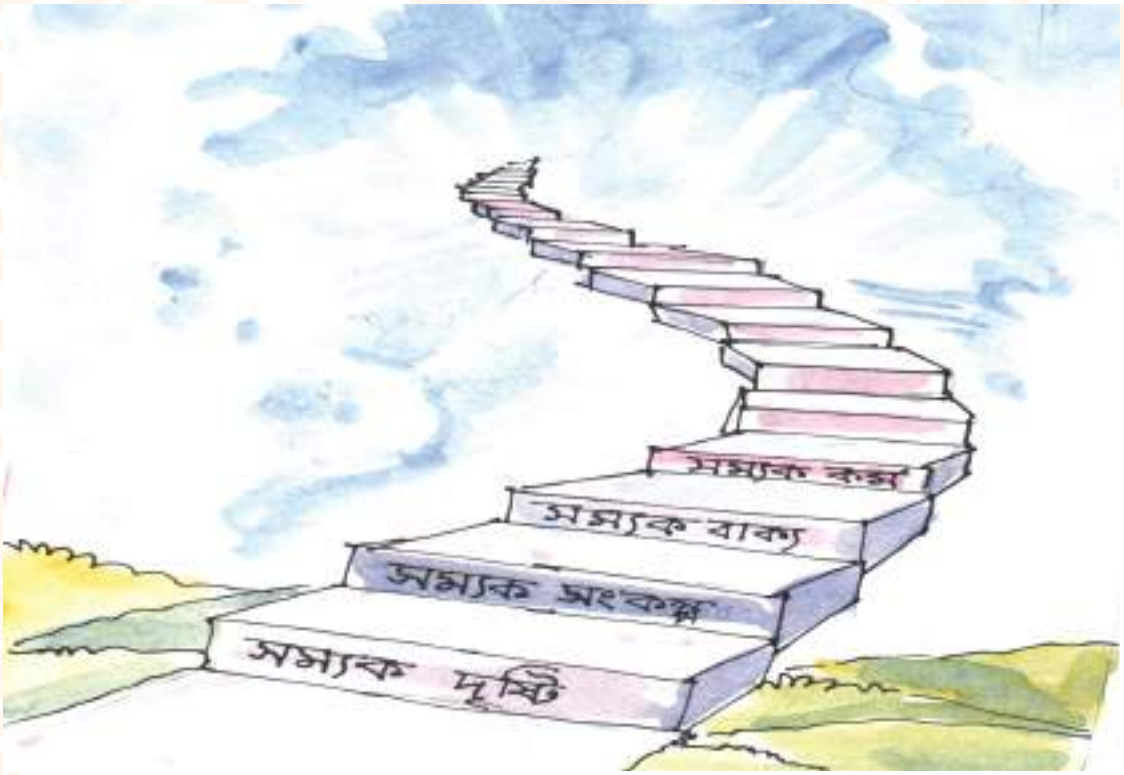

চিত্র ৩: আদর্শ জীবনের সোপান আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

সম্যক দৃষ্টি: সবকিছু সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা। ভ্রান্তি বা অবিদ্যামুক্ত হওয়া। জীবজগৎ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবই হলো অবিদ্যা। সুতরাং সম্যক দৃষ্টি মানে সর্ব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান। অর্থাৎ, সর্বদা কোনো কাজ করার আগে সে কাজের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হওয়া বা চিন্তা করা। এরূপ মনোভাবনাকে সম্যক দৃষ্টি বলে।

সম্যক সংকল্প: সংকল্পে দৃঢ়তা সম্পন্ন হওয়া। শুদ্ধ, সুন্দর জীবন গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। এর জন্য অন্তরের সকল কালিমা যথা– হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ প্রভৃতি পরিহার করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াই সম্যক সংকল্প।

সম্যক বাক্য: অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যক কথা বলার ক্ষেত্রে সংযম রক্ষায় প্রত্যয়ী হওয়াই সম্যক বাক্য। মিথ্যা কথা, কটু কথা, এমনকি পরনিন্দা, পরচর্চা ও অর্থহীন যে কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকাই হলো সম্যক বাক্য অনুশীলন প্রক্রিয়া।

সম্যক কর্ম: সৎ ও মঙ্গলময় কর্ম সম্পাদন করা। কথা ও কাজে সৎ থাকা। সর্বদা নৈতিক আচরণ অনুশীলন করাই হলো সম্যক কর্ম। কোনো প্রকার অপরাধ না করা। অনুমতি ছাড়া কারো কোনো জিনিস স্পর্শ না করা, এবং কারো কোনো জিনিসের প্রতি লোভ না করা। এভাবে নিজের কাজকে সর্বদা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখাই হলো সম্যক কর্ম।

সম্যক জীবিকা: সততার সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ করা। লোভ ও বাসনা ত্যাগ করে সততার সঙ্গে জীবিকা অর্জনই সম্যক জীবিকা। নিজের জীবিকার জন্য কখনো কোনো অন্যায় পথের আশ্রয় না নেয়াই হলো সম্যক জীবিকা বা সম্যক আজীব।

সম্যক প্রচেষ্টা: এটি হলো অন্তরের গভীর প্রচেষ্টা। বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে নিজের মনকে পবিত্র রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ই হলো সম্যক প্রচেষ্টা। এটিকে সম্যক ব্যায়ামও বলে। মন্দ চিন্তা না করা, মন্দ চিন্তা উৎপন্ন হলে তা বিনাশ করা, ভালো চিন্তা উদ্ভবের প্রচেষ্টা করাই সম্যক ব্যায়ামের মূল লক্ষ্য।

সম্যক স্মৃতি: স্মৃতি হলো নিজেকে চেনা ও জানার চিন্তায় নিমগ্ন থাকা। আমার এই শরীর ও আমি যে এক নই, এটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। সব অনিত্য। কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এটি গভীরভাবে অনুধাবনের চেতনায় নিজের চিত্তকে নিয়োজিত রাখাই স্মৃতি। এরূপ চিন্তা সর্বদা মঙ্গলময় কর্মের দিকে মনকে ধাবিত রাখে।

সম্যক সমাধি: চিত্তের একাগ্রতা সাধনই সমাধি। সর্ব প্রকার লোভ, হিংসা, বিদ্বেষমুক্ত হয়ে স্থির চিত্তভাব অর্জনই সাধনার লক্ষ্য। এরূপ চিত্ত কখনো কোনো মন্দ কাজ করতে পারে না। সর্বদা ভালো এবং সকলের জন্য মঙ্গলদায়ক কাজই করে। সমাধি এক প্রকার ভাবনা। শুদ্ধ ও কল্যাণকাজের ভাবনা। এরূপ ভাবনাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনো দুঃখ ও কষ্ট পায় না।

ক-কলামের সঙ্গে খ-কলামের মিল করো–

ক	খ
সম্যক দৃষ্টি	মিথ্যা, কটু, এমনকি অর্থহীন যে কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকা।
সম্যক সংকল্প	সততার সঙ্গে আয় করে জীবন নির্বাহ করা।
সম্যক বাক্য	সর্ব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান।
সম্যক কর্ম	নিজেকে জানার চিন্তায় মগ্ন থাকা।
সম্যক জীবিকা বা আজীব	বিশুদ্ধ জীবন গঠনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।
সম্যক প্রচেষ্টা বা ব্যায়াম	সর্বদা নৈতিক আচরণ অনুশীলন করা।
সম্যক স্মৃতি	চিত্তে একাগ্রতা আনয়নের সাধনা করা।
সম্যক সমাধি	শুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখার দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া।

মহাপরিনির্বাণ

গৌতম বুদ্ধ সকল প্রাণির কল্যাণ ও দুঃখ মুক্তির মহান ব্রত নিয়েই কঠোর সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। এরপর সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি দিকে দিকে ভ্রমণ করে তাঁর ধর্ম-দর্শন প্রচার করেন। এক মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি বহু শিষ্য নিয়ে বৈশালীর চাপাল চৈত্য-নামক উদ্যানে উপস্থিত হলেন। সে সময় তিনি উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ ও উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন, তাঁর বয়স পরিপূর্ণ হয়েছে। তিনি এখন পরিনির্বাপিত হবেন। উৎপন্ন সব কিছুই ক্ষয়শীল। আগামী বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি আয়ু সংস্কার বা জীবন ত্যাগ করবেন। জগতের আলো গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করবেন। এর তিন মাস পর বৈশাখী পূর্ণিমার আগে তিনি ভিক্ষুসংঘসহ কুশীনগরে উপস্থিত হলেন। কুশীনগরের পাবা নামক স্থানে এসে তিনি স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সেখানে আহার শেষে তিনি অসুস্থ বোধ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি যাত্রায় বিরতি নেননি। পাবা থেকে গেলেন তিনি মল্লদের শালবনে। সেখানে যমক (জোড়া) শালগাছের নিচে বিশ্রামের জন্য মনস্থ করলেন। সেবক আনন্দ থের ঘুমানোর জায়গার ব্যবস্থা করলেন। তিনি ডান হাতে মাথা রেখে শয্যা গ্রহণ করলেন।

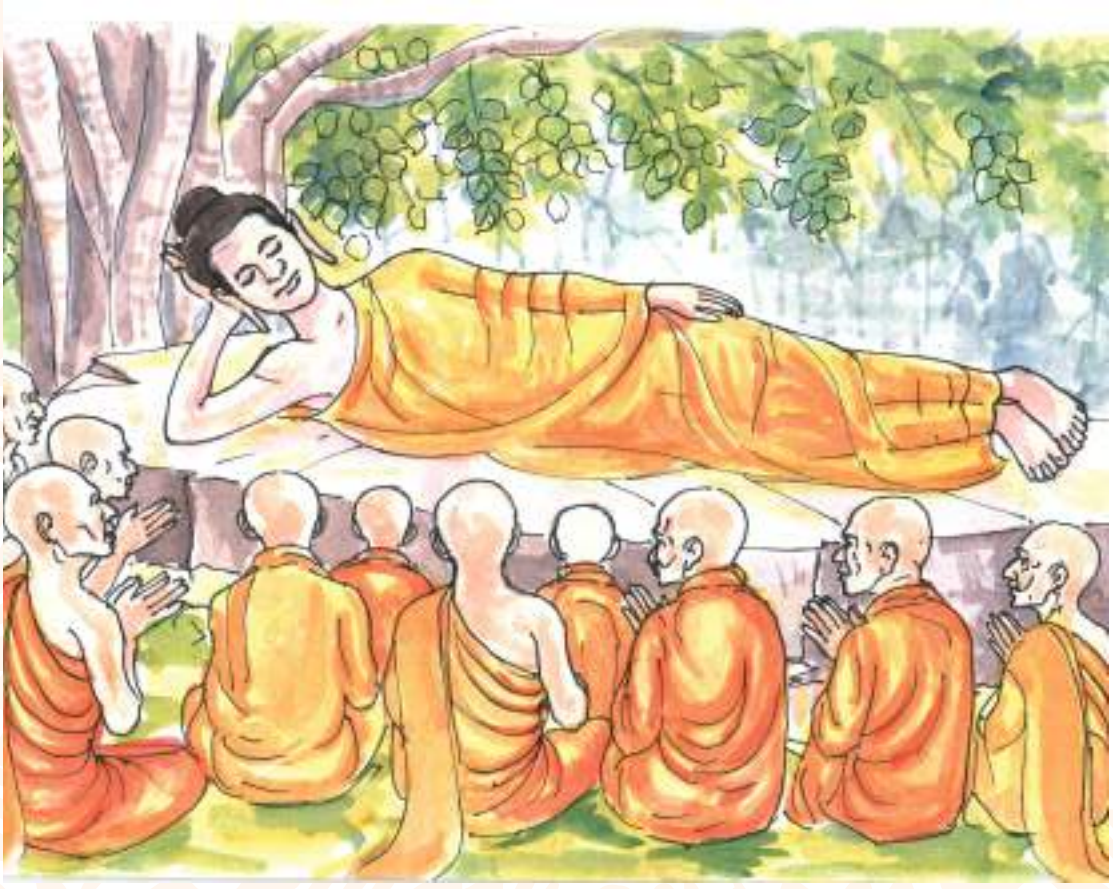

চিত্র ৪: কুশিনগরের জোড়া শালবৃক্ষতলে নির্বাণশয্যায় বুদ্ধের ধর্ম-দেশনা

আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি সমাগত। বুদ্ধের সেবক প্রিয় শিষ্য আনন্দ ও অন্য ভিক্ষুরা বুদ্ধের চারপাশে উপবিষ্ট। বুদ্ধের অন্তিম সময়ে আনন্দ অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়েন। আনন্দের উদ্দেশে বুদ্ধ বললেন, 'আনন্দ! অত্তদীপা বিহরথ, অত্তসরণা অঞ্ঞসরণা, ধম্মদীপা বিহরথ ধম্মসরণা অঞ্ঞসরণা।' অর্থাৎ, হে আনন্দ! নিজেই নিজের দীপ হয়ে বিচরণ করো, আত্ম শরণই অনন্য শরণ, ধর্মদীপ হয়ে বিচরণ করো। ধর্মের শরণই অনন্য শরণ। তিনি আরও বলেন, 'হে আনন্দ! আমার অবর্তমানে তোমাদের মনে হতে পারে, শাস্তার উপদেশ শেষ হয়েছে, আমাদের আর শাস্তা নেই। আনন্দ! তোমরা তা মনে করবে না। হে আনন্দ! আমার যে ধর্ম-বিনয় দেশিত ও নির্দেশিত হয়েছে সেই ধর্ম-বিনয়কে আমার অবর্তমানে তোমরা শাস্তা বলে জানবে। এ সময় তিনি তাঁর শেষ উপদেশ প্রদান করেন, 'হে ভিক্ষুগণ! সংস্কারসমূহ ব্যয় ও ক্ষয়শীল। অপ্রমাদের সঙ্গে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে তৎপর হও।' শেষ বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। একটির পর একটি ধ্যানের স্তর অতিক্রম করে তিনি নিরোধ সমাধি বা গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন এবং রাত্রির তৃতীয় যামে পরম সুখময় মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধের পূতাস্থি বা দেহাবশেষ আট ভাগে ভাগ করা হয়। অজাতশত্রু, লিচ্ছবিগণ, শাক্যগণ, বুলিয়গণ, কোলিয়গণ, বেঠদ্বীপবাসী, পাবার মল্লগণ ও কুশীনারার মল্লরা পূতাস্থির অংশ লাভ করেন। বুদ্ধের পূতাস্থি 'বুদ্ধ ধাতু' নামে অভিহিত। বৌদ্ধরা এখনো বুদ্ধ ধাতুর উদ্দেশ্যে বন্দনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

গৌতম বুদ্ধ পরিনির্বাণকালে কী উপদেশ দিয়েছিলেন তা লেখো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ত্রিপিটক পরিচয়: সূত্র পিটক

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যা আছে–

- ত্রিপিটক পরিচিতি
- সূত্র পিটক পরিচিতি
- সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ের নাম ও বিষয়বস্তু
- খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থ পরিচিতি

ত্রিপিটক ও সূত্র পিটক

নিচে বাম পাশের বক্সে তোমার জানা কয়েকটি বইয়ের নাম লেখো। এই বইগুলোর মধ্যে যদি কোনো ধর্মীয় বই থাকে সেগুলোর নাম ডান পাশের বক্সে লেখো–

জানা বইয়ের নাম	ধর্মীয় বইয়ের নাম
১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।	

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

ত্রিপিটক পরিচয়

প্রত্যেক ধর্মের পৃথক ধর্মীয় গ্রন্থ আছে। ধর্মীয় গ্রন্থকে 'পবিত্র গ্রন্থ' বলা হয়। এই গ্রন্থের মধ্যেই ধর্মের মূল তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকে। ধর্মগ্রন্থকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে পাঠ করতে হয়। ধর্মগ্রন্থ পাঠে মানুষের জীবনে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। ধর্মগ্রন্থ থেকে সুন্দর আচরণ ও ন্যায়-নৈতিকতাসহ অনেক কিছু শেখা যায়। তাই প্রত্যেকের জীবনে ধর্মীয় গ্রন্থের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এরূপ বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র ত্রিপিটকে বহু বিষয় যুক্ত রয়েছে।

ত্রিপিটক: ত্রিপিটক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। ত্রিপিটকে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের মূল নির্যাস নিহিত। মহামতি বুদ্ধের মুখনিঃসৃত অমূল্য বাণীর সংকলন এ 'ত্রিপিটক'। ত্রিপিটক শব্দটি 'ত্রি' এবং 'পিটক' শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে 'ত্রি' সংখ্যাবাচক শব্দ। এর অর্থ তিন। আর 'পিটক' হলো বস্তুবাচক শব্দ। এ 'পিটক' শব্দের অর্থ হলো আধার, পেটিকা, ঝুড়ি ইত্যাদি। অর্থাৎ 'ত্রিপিটক' মানে তিনটি পিটক। বুদ্ধবাণীর ধরন ও প্রকৃতি অনুসারে তিনটি ধারায় বিভক্ত করে তিনটি পেটিকা বা পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। এই তিনটি পিটককে একত্রে 'ত্রিপিটক' বলে। ত্রিপিটক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এবং মূল্যবান গ্রন্থ। হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তারা এই গ্রন্থটি অনুসরণ করে।

ত্রিপিটক

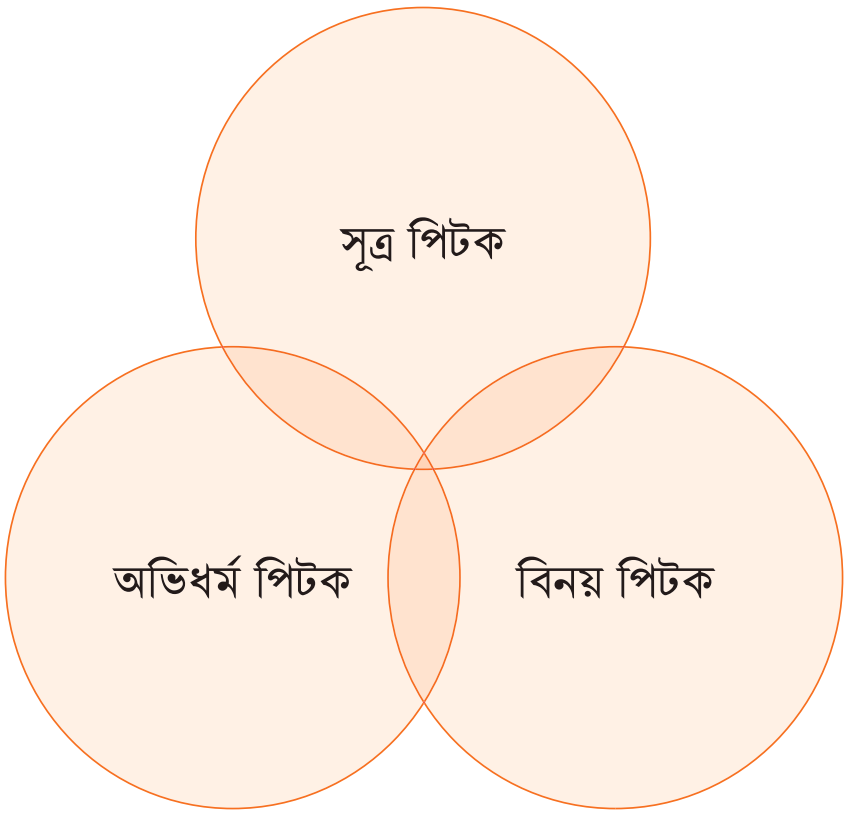

ত্রিপিটকের ভাষা পালি। পালি প্রাচীন ভারতের একটি ভাষা। এই ভাষা বেশির ভাগ মানুষের বোধগম্য ছিল। এটি তথাগত গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ভারতীয় সমাজের প্রচলিত ভাষা। পবিত্র ত্রিপিটক এই ভাষায় রচিত হয়েছে। এভাবে ত্রিপিটকের মূল বিষয়ের সঙ্গে ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক ইতিহাসসহ নানা বিষয় এতে সংযুক্ত রয়েছে। এজন্য পবিত্র ত্রিপিটককে প্রাচীন ভারতীয় তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবেও মূল্যায়ন করা হয়। ত্রিপিটকের মূল বিষয়গুলোকে বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেই তিনটি মূল ভাগকেই তিনটি পিটক বলা হয়। প্রত্যেক ভাগের পৃথক নাম রয়েছে।

আমরা জানি, ত্রিপিটকের মূল বিষয় তিনটি পিটকে অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হলো যথাক্রমে–

১। বিনয় পিটক

২। সূত্র পিটক এবং

৩। অভিধর্ম পিটক।

বিষয়ের বৈশিষ্ট্যভেদে এই নামকরণ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পিটকের বিষয়বস্তু কয়েকটি খণ্ডে সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমরা সূত্র পিটক সম্পর্কে জানবো।

সূত্র পিটক

ত্রিপিটকের একটি অন্যতম অঙ্গ সূত্র পিটক। সূত্র পিটকে তথাগত বুদ্ধের ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসসমৃদ্ধ নানা বিষয় সংযুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে বুদ্ধের ভাষিত সকল বাণী এ পিটকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলো গদ্যে ও পদ্যে বর্ণিত। এগুলোর একেকটিকে সূত্র বলে। প্রত্যেক সূত্রের পৃথক নাম রয়েছে। সূত্র পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা– দীর্ঘ নিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায়। নিম্নে নিকায়সমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো।

সূত্র পিটক

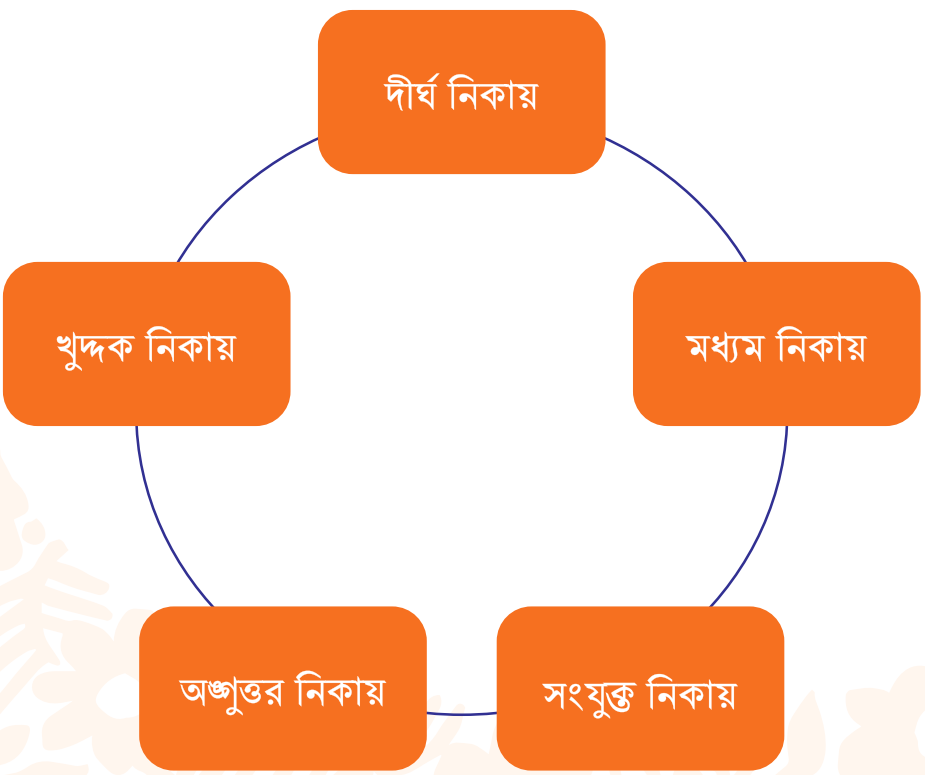

সূত্র পিটকের বিষয়বস্তু: দীর্ঘ নিকায় ও মধ্যম নিকায়

এখন আমরা সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হব। তবে এ সেশনে প্রথম দুটি নিকায় সম্পর্কে জানব।

ক) দীর্ঘ নিকায়

দীর্ঘ নিকায় সূত্র পিটকের প্রথম গ্রন্থ। দীর্ঘ নিকায়ে সর্বমোট চৌত্রিশটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো তিনটি বর্গে বিভক্ত। যথা– শীলস্কন্ধবর্গ, মহাবর্গ এবং পাটিকবর্গ। এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু দান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, ধ্যান, নির্বাণ ইত্যাদি। এ নিকায়ে বুদ্ধের সমসাময়িক প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিশেষত প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য এতে আছে। এই নিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধের শেষ জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলির বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়াও দীর্ঘ নিকায়ে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনের বহু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ রয়েছে।

খ) মধ্যম নিকায়

এটি সূত্র পিটকের দ্বিতীয় ভাগ। পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে মধ্যম নিকায় সর্বোত্তম। যে-সূত্রগুলো মধ্যম আকৃতির সেগুলো এই নিকায়ে স্থান পেয়েছে। এতে একশ বাহান্নটি সূত্র আছে। মধ্যম নিকায়ে বুদ্ধের সময়ের অন্য ধর্ম-দর্শন সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, ভিক্ষুসংঘের সঙ্গে গৃহী ও রাজন্যবর্গের সম্পর্ক, বুদ্ধকালীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণও পাওয়া যায়। ভিক্ষুসংঘের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অপরিহার্য আচরণীয় অনেক বিষয় এ-গ্রন্থে সরলভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দীর্ঘ নিকায় এবং মধ্যম নিকায়ের আলোচ্য বিষয়গুলো সংক্ষেপে লেখো–

দীর্ঘ নিকায়	মধ্যম নিকায়

সূত্র পিটকের বিষয়বস্তু: সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়

এ সেশনে আমরা সূত্র পিটকের অন্য তিনটি নিকায় সম্পর্কে জানব।

গ) সংযুক্ত নিকায়

সংযুক্ত নিকায়ে বুদ্ধের মহাজীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনির সংযুক্তি ঘটেছে। প্রত্যেকটি সংযুক্তি স্বতন্ত্র নামে যুক্ত হয়েছে। এতে ছাপ্পান্নটি সংযুক্ত বা অধ্যায় আছে। সূত্রগুলো নৈতিক, মনস্তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিয়। দীর্ঘ ও মধ্যম নিকায়ের তুলনায় সংযুক্ত নিকায়ের সূত্রগুলো ছোটো হলেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়বস্তু তিনটি ধারায় বিভাজন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ-নিকায়ে কিছু ছোটো ছোটো কবিতা বা গাথা আছে, যার সাহিত্যিক ও দার্শনিক মূল্য অপরিসীম। কথোপকথনের আকারে এখানে অনেক সূত্র রয়েছে। সুতরাং, বলা যায় সংযুক্ত নিকায় ধর্ম-দর্শন ও নৈতিক বিষয়ের বর্ণনায় সমৃদ্ধ।

ঘ) অঙ্গুত্তর নিকায়

অঙ্গুত্তর নিকায়ের সূত্রগুলো গদ্যে ও পদ্যে রচিত। এতে ছোটো ও মধ্যম আকারের অনেকগুলো সূত্র রয়েছে। সুত্রগুলো এগারোটি নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত। আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা অনুসারে নিপাতসমূহের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন– এক নিপাতে একটি বিষয়যুক্ত সূত্রসমূহ স্থান পেয়েছে। অনুরূপ দুই নিপাতে দুইটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এভাবে অঙ্গুত্তর নিকায়ে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। অন্যান্য নিকায়ের মতো অঙ্গুত্তর নিকায়েও শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, বীর্য ও বিনয়-সম্পর্কিত বিষয়াবলির আলোচনা আছে। এখানে বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকার দায়িত্ব-কর্তব্য ও আচার-আচরণ, এবং উপোসথ পালনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যবান বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া বুদ্ধের সমকালীন বিভিন্ন রাজা-মহারাজা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাই, অঙ্গুত্তর নিকায়ের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

ঙ) খুদ্দক নিকায়

খুদ্দক নিকায় সুত্ত পিটকের সর্বশেষ অংশ। এ নিকায়ের বিষয়বস্তু ষোলো ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ খুদ্দক নিকায় ষোলোটি গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত। একেকটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু একেক রকম। গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। তবে, সব বিষয়ের মধ্যে নৈতিকতা ও বিশুদ্ধ জীবনাচরণের উপদেশ আছে। তাই খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলো আকারে ছোটো হলেও এগুলোর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলো হলো: ১. খুদ্দক পাঠো ২. ধম্মপদ ৩. উদান ৪. ইতিবুত্তক ৫. সুত্তনিপাত ৬. বিমানবত্থু ৭. পেতবত্থু ৮. থের গাথা ৯. থেরী গাথা ১০. জাতক ১১. মহানিদ্দেস ১২. চুলনিদ্দেস ১৩. পটিসম্ভিদামার্গ ১৪. অপদান ১৫. বুদ্ধবংস এবং ১৬. চরিয়াপিটক।

সুতরাং, ত্রিপিটকের সূত্রপিটক বলতে উপরে বর্ণিত সকল অংশের বা পাঁচটি নিকায়ের বইয়ের সমষ্টিকে বোঝানো হয়। এভাবে এখানে সূত্রপিটকের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

এই পাঠে আমরা ত্রিপিটক ও ত্রিপিটকের একটি অংশ সুত্রপিটক সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। যা ভবিষ্যতে আমাদের জীবনে মূল্যবান অভিজ্ঞতা হিসেবে ভূমিকা রাখবে। ত্রিপিটকে বৌদ্ধধর্মীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে নৈতিক ও মানবিক অনেক উপদেশ রয়েছে। যেগুলো সর্বজনীন মূল্যবোধসম্পন্ন। মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর পথের যাত্রী হতে সহায়তা করে। তাই ত্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হলেও এর সর্বজনীন গুরুত্ব অপরিসীম।

একক বা দলগতভাবে সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লেখো-

নিকায়ের নাম	বিষয়বস্তু
	১। ২।
	১। ২।
	১। ২।

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই:

১। বুদ্ধের প্রথম ধর্ম-দেশনা কী নামে পরিচিত?
ক) মহাপরিনির্বাণ সূত্র খ) ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র গ) অনাত্তা লক্ষণ সূত্র ঘ) মহানিদান সূত্র

২। 'মহাবর্গ' কোন নিকায়ের অন্তর্গত?
ক) মধ্যম নিকায় খ) দীর্ঘ নিকায় গ) সংযুক্ত নিকায় ঘ) খুদ্দক নিকায়

৩। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য চতুরার্য সত্য অনুসারে কোন পথ অবলম্বন করতে হবে?
ক) চিত্তশুদ্ধি খ) কঠোর তপস্যা গ) আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ঘ) উপবাস ও পূজা

৪। 'সর্ব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান' আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কোন মার্গ বা পথের অন্তর্গত?
ক) সম্যক বাক্য খ) সম্যক কর্ম গ) সম্যক দৃষ্টি ঘ) সম্যক সমাধি

৫। বুদ্ধ কোথায় মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন?
ক) রাজগৃহ খ) লুম্বিনী গ) কুশীনগর ঘ) সারনাথ

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি:

১। ত্রিপিটক _____ ভাষায় রচিত।

২। বুদ্ধ প্রথম ধর্ম দেশনায় _____ তত্ত্বটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন।

৩। দুঃখ নিরোধ আর্য্যসত্য হলো দুঃখ থেকে _____।

৪। সর্বদা নৈতিক আচরণ অনুশীলন করাই হলো _____ কর্ম।

৫। চিত্তের একাগ্রতা সাধনই _____।

গ) মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। সম্যক সমাধি হলো	ক) সারনাথের মৃগদাব।
২। কুশীনগরে	খ) মিথ্যা, কটু, এমনকি অর্থহীন যেকোন কথা বলা থেকে বিরত থাকা।
৩। বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের স্থান	গ) চিত্তে একাগ্রতা আনয়নের সাধনা করা।
৪। সম্যক বাক্য হলো	ঘ) সংঘ হয়।
৫। পাঁচজন ভিক্ষুর সমাহারে	ঙ) বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। চতুরার্য সত্য হলো বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। দুঃখ নিরোধ অর্থ– জীবনভর কষ্ট সহ্য করা। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে দুঃখ মুক্তির পথে পরিচালিত করে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। একজন শিক্ষার্থী ত্রিপিটক পাঠ করে নৈতিক জীবন গঠন করতে পারে শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। বুদ্ধ লুম্বিনী-তে মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন । শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের নাম লেখো।

২। চতুরার্য সত্য কী কী?

৩। তোমার চিত্তে দুঃখ উৎপত্তির কয়েকটি কারণ লেখো।

৪। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কয়টি ও কী কী?

৫। সূত্র পিটকের পাঁচটি নিকায়ের নাম লেখো।

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। গৌতম বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের বর্ণনা দাও।

২। দীর্ঘ নিকায় ও মধ্যম নিকায়ের পার্থক্য লেখো।

৩। তোমার জীবনে ‘চতুরার্য সত্য’ কী প্রভাব ফেলে – ব্যাখ্যা করো।

৪। বুদ্ধের অন্তিম উপদেশ সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

৫। তুমি ‘আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ’ নিজ জীবনে কীভাবে অনুশীলন করবে লেখো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদর্শ জীবন চরিত

এ অধ্যায়ে যা আছে–

- শ্রেষ্ঠী পরিচিতি
- বুদ্ধের সমকালীন কয়েকজন শ্রেষ্ঠী ও রাজার নাম
- আনন্দ থের'র পরিচিতি
- আনন্দ থের'র প্রদত্ত শর্ত ও গুণাবলি
- কৃশা গৌতমীর পরিচিতি
- রাজা বিম্বিসারের পরিচিতি ও বৌদ্ধধর্মের প্রচারে রাজা বিম্বিসারের অবদান
- আদর্শ জীবন চরিত পাঠের সুফল

আদর্শ জীবন

তোমার আশেপাশের অনেক ভালো মানুষের কথা হয়তো তুমি শুনেছ। তাঁদের মধ্যে তোমার পরিচিত-অপরিচিত মহান ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ, এমনকি তোমার বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদু-ঠাকুরমা, দাদু-দিদিমা, মাসি-পিসি, নানা আত্মীয়স্বজন থাকতে পারে। তোমার দেখা বা জানা একজন ভালো মানুষ সম্পর্কে তোমার ধারণা কী লেখো–

নাম	তাঁর সম্পর্কে যা জান

** এ রকম আরও ভালো মানুষ সম্পর্কে প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

শুভ্র এবং জয়ী ভাই-বোন। তাদের ঠাকুরমা প্রায় প্রতিরাতে তাদেরকে গল্পের বই পড়ে শোনান। তবে তাদের বেশি ভালো লাগে আনন্দপ্রিয় ভিক্ষুর ধর্মীয় গল্পের বই। কারণ এ বইয়ে কার্টুন চিত্রের মাধ্যমে নানান গল্প এবং মহান ব্যক্তির জীবনী সহজ-সরলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একদিন তারা বাবার কাছ থেকে জানতে পারল বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সীমা বিহারে চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ণিমার দিন শুভ্র ও জয়ী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিহারে গেল। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তারা দেখল অতিথি হিসেবে আনন্দপ্রিয় ভিক্ষু উপস্থিত আছেন। তিনি শিশু-কিশোরদের উদ্দেশ্যে তার লেখা ধর্মীয় গল্পগুলো বললেন। মহান ব্যক্তির আদর্শ উপস্থাপন করে তিনি সবাইকে আদর্শবান, নীতিবান ও সৎ হওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন। কৌতূহলী শুভ্র ও জয়ী এক পর্যায়ে ভিক্ষুর কাছে আদর্শ জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন ভিক্ষু বলেন– বৌদ্ধধর্মের প্রচারে অনেক মহান ব্যক্তি অবদান রাখেন। যাঁদের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করে। এমনকি ভারতবর্ষের বাইরেও বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা ছিলেন পরোপকারী। সর্বদা সৎভাবে জীবনযাপন করতেন। মানবকল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে সুপথে পরিচালিত করতেন। সেসব মহান ও আদর্শবান ব্যক্তিদের মধ্যে থের-থেরী, উপাসক-উপাসিকা, রাজা-মহারাজা এবং শ্রেষ্ঠীগণ ছিলেন অন্যতম।

শুভ্র এবং জয়ী খুব মনোযোগ সহকারে ভন্তের কথা শুনলেন। তারা এ বিষয়ে আরও জানতে আগ্রহী। এবার জয়ী ভন্তেকে জিজ্ঞেস করলেন, ভন্তে! 'থের-থেরী, রাজা-মহারাজা এবং শ্রেষ্ঠী' এরা কারা। তখন ভন্তে বললেন, শ্রেষ্ঠী শব্দের অর্থ হলো বণিক, ব্যবসায়ী, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, সম্পদশালী ব্যক্তি ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অনেক শ্রেষ্ঠীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে আজীবন কাজ করেছেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে উদারভাবে দান করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বুদ্ধের সমকালীন কয়েকজন শ্রেষ্ঠীর মধ্যে অনাথপিন্ডিক শ্রেষ্ঠী, মিগার শ্রেষ্ঠী, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী, উগ্গশ্রেষ্ঠীর নাম উল্লেখযোগ্য।

থের-থেরী বলতে সহজ কথায় ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে বোঝায়। তাঁরা ধর্মত ও বিনয়সম্মত জীবনযাপন করতেন। বুদ্ধ সময়ের থের-থেরীগণের মধ্যে মহাকশ্যপ, আনন্দ, উপালি, পটাচারা, সুমনা, কৃশা গৌতমীর নাম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বুদ্ধের ধর্ম প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা দানে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখেন অনেক রাজা-মহারাজা। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের গৃহী শিষ্য। বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতিতে বুদ্ধের সময়ে যেসব রাজন্যবর্গ অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে রাজা বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ ছিলেন অন্যতম।

ভন্তের কথা শুনে শুভ্র ও জয়ী ভীষণ খুশি হলো। দেশনা শেষে তারা ভন্তেকে বন্দনা করে বাড়িতে ফিরে যায় ।

উল্লেখিত গল্পে তোমরা মহান ও আদর্শবান ব্যক্তি সম্পর্কে জেনেছ। পূর্বের শ্রেণিতেও তোমরা বুদ্ধের সমকালীন কয়েকজন ব্যক্তিত্বের জীবনাদর্শ সম্পর্কে জেনেছ। এ অধ্যায়ে আমরা আনন্দ থের, কৃশা গৌতমী এবং রাজা বিম্বিসার সম্পর্কে জানব।

গল্পের আলোকে মহান ব্যক্তির গুণাবলি লিখে নিচের ছকটি পূরণ করো–

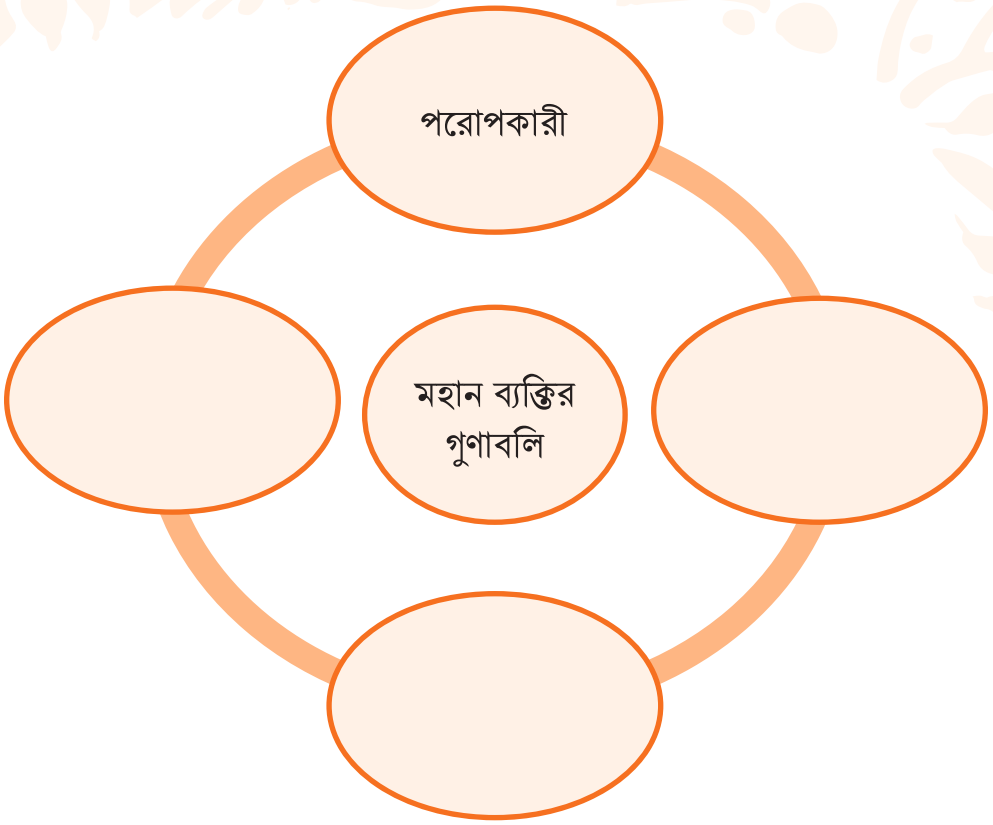

জোড়ায় অথবা নিজে অনুসন্ধান করে নিচের নামগুলো সঠিক স্থানে (ঘরে) লেখো:

সুমনা, বিম্বিসার, অনাথপিণ্ডিক, আনন্দ, মিগার, উপালি, ধনঞ্জয়, কণিষ্ক, উগ্ন, মহাকাশ্যপ, অশোক, পটাচারা, প্রসেনজিৎ, কৃশা গৌতমী, অজাতশত্রু

থের-থেরী	রাজা-মহারাজা	শ্রেষ্ঠী

আনন্দ থের

এ পাঠে আমরা আনন্দ থের'র জীবনী এবং যেসব শর্তে তিনি বুদ্ধের প্রধান সেবক পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে জানব।

গৌতম বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে আনন্দ ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁর পিতার নাম অমিতোদন এবং মাতার নাম জনপদকল্যাণী। অমিতোদন ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ভাই এবং সিদ্ধার্থ গৌতমের কাকা। সে হিসেবে আনন্দ হলেন সিদ্ধার্থ গৌতমের কাকাতো ভাই। আনন্দ ও সিদ্ধার্থ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মের পর নবজাতক আনন্দকে দেখে জ্ঞাতিগণ এবং পরিবারের সবাই ভীষণ আনন্দ লাভ করেছিল। এ কারণে তাঁর নাম রাখা হয় আনন্দ।

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা জেনে আনন্দ অন্যান্য শাক্য রাজকুমারদের সঙ্গে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। শাক্য রাজকুমারদের মধ্যে ভদ্রিয়, অনুরুদ্ধ, ভৃগু, দেবদত্ত ও কিম্বিল ছিল অন্যতম। এছাড়া নাপিতপুত্র উপালিও সেসময় ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মে আনন্দ থের'র অবদান ছিল অপরিসীম। বুদ্ধের বাণী তিনি স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন। বুদ্ধের বাণীসমূহ শুনে হুবহু অন্যকে বলতে পারতেন। এ কারণে তাঁকে বলা হয় স্মৃতিধর ও ধর্মভাণ্ডারিক। প্রথম সংগীতিতে তিনি সমগ্র সূত্র এবং অভিধর্ম আবৃত্তি করেন। বুদ্ধের বাণী সংরক্ষণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। বুদ্ধ মূলত তাঁর অনুরোধেই মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ অন্যান্য নারীকে দীক্ষা দানের মাধ্যমে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সুদেশক, জ্ঞানী ও পণ্ডিত ভিক্ষু হিসেবে আনন্দের সুখ্যাতি ছিল। অমায়িক এবং বিনয়ী আচরণের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

বুদ্ধের সেবক হতে আনন্দ থের'র শর্তাবলি

প্রথম জীবনে বুদ্ধের কোনো সেবক ছিল না। পরবর্তীকালে বহু ভিক্ষু অস্থায়ীভাবে তাঁর সেবা করেন। বুদ্ধের বয়স যখন ৫৫ বছর তখন এক ধর্মসভায় বুদ্ধের স্থায়ী সেবক নিয়োগ বিষয়ে আলোচনা হয়। সে সভায় সেবক পদের জন্য আনন্দ থের'র নাম প্রস্তাবিত হয়। আনন্দ ৮টি শর্তে বুদ্ধের প্রধান সেবক হতে রাজি হয়। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১) বুদ্ধ নিজের প্রাপ্ত চীবর আনন্দকে দেবেন না।
২) বুদ্ধ নিজের প্রাপ্ত পিণ্ড বা অন্ন আনন্দকে দেবেন না।
৩) যে গন্ধকুটিতে বুদ্ধ অবস্থান করেন সেখানে আনন্দকে থাকতে বলবেন না।
৪) বুদ্ধ যেন আনন্দের গৃহীত নিমন্ত্রণে গমন করেন।
৫) বুদ্ধকে কেউ বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করলে সেখানে আনন্দকে যেন সঙ্গে নিয়ে না যান।
৬) আনন্দের মাধ্যমে কেউ বুদ্ধের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হলে বুদ্ধ যেন তাকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন।
৭) ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য তিনি যেন যেকোনো সময় বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।
৮) আনন্দের অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ কোনো ধর্মদেশনা করলে তা যেন আনন্দকে পরে বলেন।

আনন্দ সেবক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর হতে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সেবা করেছেন। তিনি একাগ্রচিত্তে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতেন।

চিত্র ৫: বুদ্ধের পাশে দাঁড়ানো আনন্দ থের

আনন্দ থের'র গুণাবলি

এ পাঠে আমরা আনন্দ থের'র কিছু গুণ সম্পর্কে জানব। আনন্দ থের একজন বহুগুণসম্পন্ন ভিক্ষু। তাঁর সেই গুণের কারণেই তিনি মহান বুদ্ধের সেবক হতে পেরেছিলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে আনন্দ থের'র চারটি গুণের কথা বলেছিলেন। সেগুলো হলো:

১) আনন্দকে দেখে ভিক্ষুগণ সন্তোষ বা আনন্দ লাভ করেন।

২) আনন্দের ধর্ম দেশনা শুনে ভিক্ষুগণ সন্তুষ্টি লাভ করেন।

৩) আনন্দের সঙ্গে কথা বলে ভিক্ষুগণ তৃপ্তি লাভ করেন।

৪) আনন্দকে দেখে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাগণ পরম আনন্দ লাভ করেন।

জোড়ায় অথবা নিজে আনন্দ থের'র তিনটি অবদানের কথা লেখো–

নিচের ছকে আনন্দ থের'র কয়েকটি গুণ লিখে সেসব গুণাবলি তুমি কীভাবে পালন করবে তা লেখো–

আনন্দ থের'র গুণাবলি	তুমি কীভাবে পালন করবে
আনন্দের সঙ্গে কথা বলে ভিক্ষুগণ তৃপ্তি লাভ করেন।	ছোটো-বড়ো সকলের সঙ্গে বিনয়ের সাথে কথা বলবো।

কৃশা গৌতমী

কৃশা গৌতমীর প্রকৃত নাম ছিল গৌতমী। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার দেহ কৃশ বা দুর্বল ছিল বলে সবাই তাঁকে কৃশা গৌতমী নামে ডাকতো। অভাব, অনাদর এবং অবহেলায় কেটেছে তাঁর শৈশব। অল্পবয়সে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল কষ্টের। জীবনে তিনি সুখ লাভ করতে পারেননি। তাঁর স্বামীও অকালে মৃত্যুবরণ করেন। এ কারণে প্রতিবেশীরা তাঁকে অনাথা বলত। একসময় তিনি এক পুত্রসন্তান জন্ম দেন। সন্তান লাভের পর সবাই তাঁকে সম্মান করতে লাগল। আদর-যত্নে তিনি সন্তানকে লালনপালন করতে লাগলেন। এই সন্তানই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। পুত্রটি বড়ো হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করল। হঠাৎ একদিন সেও মৃত্যুবরণ করে। আশা-ভরসার একমাত্র পুত্রসন্তানকে হারিয়ে কৃশা গৌতমী প্রায় পাগল হয়ে যান। পুত্রের মৃত্যু তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। মৃত পুত্রকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে সন্তানকে সুস্থ করে দিতে বললেন। সন্তানকে সুস্থ করার জন্য সবার কাছে ঔষধ চাইলেন। কেউ শোকাতুর এই জননীর কথা বুঝতে পারলেন না।

অবশেষে এক ব্যক্তি তাঁকে মহান বুদ্ধের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সে সময় বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধের কাছে গিয়ে কৃশা গৌতমী মৃত পুত্রকে জীবন দানের প্রার্থনা জানালেন। মৃত পুত্রের জন্য তিনি বুদ্ধের কাছে ঔষধ চাইলেন। তাঁর মনের অশান্তি দূর করার জন্য বুদ্ধ বললেন, 'মানুষ মারা যায়নি এমন ঘর থেকে এক মুঠো সরিষার বীজ এনে দিতে পারলে তোমার সন্তানকে বাঁচাতে পারি।' আশান্বিত হয়ে তিনি প্রতিবেশীদের কাছে সরিষার বীজ প্রার্থনা করলেন। তিনি প্রতিটি ঘর থেকে সরিষার বীজ পেলেও মানুষ মারা যায়নি এমন কোনো ঘরের সন্ধান পাননি। তখন তিনি বুঝতে পারলেন মানুষ মরণশীল। প্রতিটি ঘরে কেউ না কেউ মারা গেছে। এ সত্য উপলব্ধি করার পর তিনি শান্ত হলেন। তাঁর দুঃখ কিছুটা লাঘব হওয়ার পর মৃত সন্তানকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করেন। পরে তিনি বুদ্ধের কাছে ফিরে আসেন।

চিত্র ৬: বুদ্ধের সম্মুখে মৃত পুত্র কোলে কৃশা গৌতমী

কৃশা গৌতমীকে দেখে বুদ্ধ বুঝতে পারলেন যে তিনি প্রকৃত সত্য অবগত হয়েছেন। বুদ্ধ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "জন্ম নিলেই মৃত্যু হবে, মৃত্যু চির সত্য।" বুদ্ধ আরও বললেন, "মহাজল প্রবাহ বা বন্যা যেমন ঘুমন্ত গ্রামকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি মৃত্যুও সকলকে হরণ করে।" বুদ্ধের উপদেশ শুনে স্রোতাপন্ন হয়ে তিনি ভিক্ষুণী হওয়ার প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা পূর্ণ হওয়ার পর তিনি ভিক্ষুণী জীবনের সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করেন। ফলে অচিরেই তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় এবং সাধনাবলে এক সময় জেতবনে অনুষ্ঠিত ভিক্ষুণীসংঘ সম্মেলনে সর্বোচ্চ আসন লাভ করেন। নিজের সাফল্যে আত্মবিশ্বাসী হয়ে তিনি বিভিন্ন গাথা ভাষণ করেন। তার কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হলো:

- সৎ ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করাকে জ্ঞানীগণ প্রশংসা করেন।
- সৎ ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে জ্ঞানী হওয়া যায়।
- সৎ মানুষকে অনুসরণ করলে জ্ঞান বাড়ে, মূর্খ ব্যক্তিও জ্ঞানী হয়।
- সৎ মানুষকে অনুসরণ করলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব।
- সৎ মানুষকে অনুসরণ করলে চতুরার্যসত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

দলগতভাবে বা বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে কৃশা গৌতমীর দুঃখের ঘটনা এবং সত্য উপলব্ধির ঘটনাগুলো উপস্থাপন করো–

দুঃখের ঘটনা	সত্য উপলব্ধির ঘটনা

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

কৃশা গৌতমীর উপদেশ তুমি কীভাবে চর্চা বা পালন করবে লেখো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

রাজা বিম্বিসার

গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ষোলোটি রাজ্য বা জনপদে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে মগধ ছিল সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। রাজধানী ছিল রাজগৃহ। বিম্বিসার ছিলেন মগধের একজন প্রখ্যাত রাজা। তিনি ষোলো বছর বয়সে রাজা হন। তিনি সুদক্ষ, বিচক্ষণ এবং সফল শাসক ছিলেন। রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। তাঁর সময়ে কোশল ছিল আরেক শক্তিশালী রাজ্য। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের বোনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের পুত্রের নাম ছিল অজাতশত্রু। যিনি পরবর্তীকালে মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। রাজা বিম্বিসার ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি বুদ্ধের উপাসক হন। বুদ্ধের কাছে তিনি দান, শীল, চতুরার্য্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর ধর্মের নীতি আদর্শে তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন। যুদ্ধ পরিহার করে তিনি মৈত্রী আর ভালোবাসার মাধ্যমে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি রাজ্যে অন্যায়, অবিচার, পশু বলি বন্ধ করেছিলেন। সুদীর্ঘ সময় তিনি

বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে কাজ করেছেন। ধর্মের বিস্তারে তিনি অশেষ অবদান রাখেন। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে তাঁর কয়েকটি অবদানের কথা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে রাজা বিম্বিসারের অবদান

রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম বিহার দাতা। তিনি গৌতম বুদ্ধের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সিদ্ধার্থ গৌতমের সঙ্গে রাজা বিম্বিসারের প্রথম দেখা হয় মগধে। সেসময় গৌতম রাজাকে কথা দিয়েছিলেন যে বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁর রাজ্যে গমন করবেন। সে কথা রক্ষায় গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের দ্বিতীয় বর্ষে ভিক্ষুসংঘসহ বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে আসেন। রাজা যথোচিত মর্যাদাসহকারে বুদ্ধের সেবা করেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের বসবাসের জন্য রাজা বেনুবন উদ্যান দান করেন। পরে এই স্থানে বেনুবন বিহার নির্মাণ করা হয়। এটিই ছিল বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম বৌদ্ধ বিহার। বিহার দান রাজা বিম্বিসারের একটি অমর কীর্তি। এ বিহারেই বুদ্ধ কয়েকটি বর্ষাবাস উদ্‌যাপন করেন। এখানে অবস্থানকালেই বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিচালনার জন্য বিনয়ের বহু নিয়ম প্রবর্তন করেন।

সে সময় অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি বা দিনে বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে ধর্মালোচনা করতেন। বুদ্ধের কাছে রাজা বিম্বিসার এসব তিথিতে উপোসথ পালনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রার্থনা জানান। তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করে বুদ্ধ ভিক্ষুদের উপোসথের ব্যবস্থা করেন। জানা যায় বুদ্ধ বর্ষাবাস পালনের সময়ও বিম্বিসারের পরামর্শে ঠিক করেন।

চিত্র ৭: বুদ্ধর সঙ্গে একান্তে রাজা বিম্বিসারের আলাপ

এছাড়াও রাজা তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক জীবককে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। একসময় লিচ্ছবিরা বুদ্ধকে বৈশালী ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। রাজা বিম্বিসার রাজগৃহ থেকে বৈশালী যাবার পথটি ভালোভাবে সংস্কার করে দেন। বুদ্ধের যাতায়াতে যেন অসুবিধা না হয় সেজন্য স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার স্থাপন করিয়ে দেন। বুদ্ধের প্রতি বিম্বিসারের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নেয়ার পর থেকে তিনি ধর্মের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর অবদানের মাঝে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

জোড়ায় অথবা নিজে বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে রাজা বিম্বিসার কীভাবে অবদান রেখেছিলেন তা লেখো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

বন্ধু/পরিবার/সমাজের কল্যাণে তুমি কী করতে চাও তার একটি তালিকা তৈরি করো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

আদর্শ জীবনচরিত পাঠের সুফল

আদর্শ মানুষ সকলের অনুকরণীয়। তাঁরা উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁরা সৎভাবে জীবনযাপন করেন। শত কষ্টের মধ্যে থাকলেও তাঁরা কখনো অন্যায় পথে জীবিকা নির্বাহ করেন না। সর্বদা তাঁরা সত্য বলেন, সদাচরণ করেন। মিথ্যা কথা বলেন না। কোনো কাজে অলসতা করেন না। উৎসাহ সহকারে কাজ করেন। মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। সর্ব প্রাণির প্রতি ভালোবাসা তাঁদের চরিত্রের অন্যতম দিক। তাঁরা মৈত্রীপরায়ণ এবং মহানুভব হয়ে থাকেন। ধর্মের প্রচার-প্রসারে তাঁরা নিবেদিত থাকেন। তাঁরা ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই অধ্যায়ে আমরা আনন্দ থের, কৃশা গৌতমী এবং রাজা বিম্বিসারের জীবনী পাঠ করেছি। আনন্দ থের'র জীবনী আমাদেরকে সেবা করতে শেখায়। মানুষের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে শেখায়। কৃশা গৌতমীর জীবনী আমাদেরকে

দুঃখের মধ্যে হতাশ না হতে শেখায়। সত্য অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। অন্যদিকে রাজা বিম্বিসারের জীবনী আমাদেরকে দান করতে, পরের ভালোর জন্য কাজ করতে শেখায়। তাঁদের জীবনী পাঠ মানুষকে অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত রাখে। মানুষকে সেবা ও ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। পরের উপকার করার মনোভাব সৃষ্টি করে। সৎ থেকে জীবন পরিচালনা করা যায়। সবসময় ন্যায়পরায়ণ হওয়া যায়। সুতরাং আমাদের আদর্শবান মানুষের জীবনী পাঠ করা উচিত। তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকের অনুসরণ করা আবশ্যক। কেননা তাঁদের জীবনী পাঠে মানব জীবনের গুরুত্বকে উপলব্ধি করা যায়। কীভাবে একজন মানুষ মহৎ ও আদর্শবান হয়ে ওঠে তা বোঝা যায়। তাঁদের জীবন থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। একাগ্র অনুশীলন ও অনুসরণের মাধ্যমেই একমাত্র লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। তাই আদর্শ ব্যক্তির জীবনী পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

দলগতভাবে অথবা বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে আদর্শ ব্যক্তির জীবনী পাঠের সুফলের একটি তালিকা তৈরি করো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

আদর্শ ব্যক্তির গুণাবলির একটি তালিকা তৈরি করে এবং তা তুমি কীভাবে চর্চা করবে লেখো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এই পৃষ্ঠায় যুক্ত করতে পারো।

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই:

১। শ্রেষ্ঠী শব্দের অর্থ হলো- ।
ক) উত্তম খ) ব্যবসায়ী গ) ভিক্ষু ঘ) সেবক

২। আনন্দ থের'র মাতার নাম-
ক) পূর্ণিমা খ) সুনন্দা গ) জনপদকল্যাণী ঘ) সুজাতা

৩। গৌতমীকে সবাই কেন কৃশা গৌতমী নামে ডাকতো?
ক) রাগী ছিল বলে খ) সবল ছিল বলে গ) কৃশ বা দুর্বল ছিল বলে ঘ) কৃপন ছিল বলে

৪। আনন্দ থের'কে শ্রুতিধর বলা হতো কেন?
ক) বুদ্ধবাণী শুনে হুবহু বলতে পারতেন বলে। খ) ভালো দেশনা করতে পারতেন বলে।
গ) বুদ্ধবাণী লিখে রাখতে পারতেন বলে। ঘ) ঋদ্ধিশক্তি ছিল বলে।

৫। কৃশা গৌতমীর জীবনী আমাদের কী শিক্ষা দেয়?
ক) কাজে অলসতা না করা খ) সর্বদা সত্য বলা
গ) ন্যায়পরায়ণ হওয়া ঘ) মানুষ মরণশীল

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি:

১। থের-থেরী বলতে _____ বোঝায়।

২। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য _____ প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। সুদেশক, জ্ঞানী ও পন্ডিত ভিক্ষু হিসেবে _____ থের'র সুখ্যাতি ছিল।

৪। কৃশা গৌতমী মৃত পুত্রের জন্য বুদ্ধের কাছে _____ চাইলেন।

৫। আনন্দ থের'র জীবনী আমাদের _____ করতে শেখায়।

গ) মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। আনন্দ ও সিদ্ধার্থ	ক) বেনুবন বিহার দান করেন।
২। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের বসবাসের জন্য রাজা বিম্বিসার	খ) মানুষ মরণশীল।
৩। সৎ ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে	গ) বুদ্ধের প্রধান সেবক হতে রাজি হয়।
৪। আনন্দ আটটি শর্তে	ঘ) একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
৫। কৃশা গৌতমী পরিশেষে বুঝতে পারেন	ঙ) জ্ঞানী হওয়া যায়।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। থের-থেরীরা ধর্মত ও বিনয়সম্মত জীবনযাপন করতেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। আনন্দ দ্বিতীয় সংগীতিতে সমগ্র সূত্র এবং অভিধর্ম আবৃত্তি করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩ বুদ্ধ আনন্দ থের'র অনুরোধে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। আদর্শ ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা আবশ্যক। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন না। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। বুদ্ধের সমকালীন কয়েকজন শ্রেষ্ঠী ও রাজার নামোল্লেখ করো।

২। আনন্দ থের'র পারিবারিক পরিচয় দাও।

৩। কৃশা গৌতমীকে অনাথা বলা হয় কেন?

৪। আনন্দ থের'র গুণাবলি কয়টি ও কী কী?

৫। আদর্শ জীবনচরিতের আলোকে তুমি কীভাবে তাঁদের আদর্শ অনুশীলন করবে।

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। কৃশা গৌতমীর উপদেশ আমাদের কেন অনুসরণ করা উচিত তা বর্ণনা করো।

২। বুদ্ধের সেবক হতে আনন্দ কী কী শর্ত দিয়েছিলেন ?

৩। বুদ্ধ কৃশা গৌতমীকে কীভাবে শান্ত করেছিলেন ব্যাখ্যা করো।

৪। বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে রাজা বিম্বিসারের অবদান ব্যাখ্যা করো।

৫। আদর্শ জীবনচরিত পাঠ করে তুমি কী কী সুফল লাভ করেছো লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়

নীতিশিক্ষা ও কর্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

অষ্টশীল ও অষ্টপরিষ্কার দান

এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যা আছে–

- অষ্টশীল পরিচিতি
- পালি ও বাংলায় প্রার্থনাসহ অষ্টশীল
- অষ্টশীল পালনের নিয়ম ও সুফল
- অষ্টপরিষ্কার দান পরিচিতি
- অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়ম ও সুফল

অষ্টশীল

চিত্র ৮: ক

চিত্র ৮: খ

চিত্র ৮: গ

উপরের কোন ছবিতে কী ধরনের ধর্মীয় কাজ করা হচ্ছে তা নিচের ছকে দলগতভাবে অথবা নিজে লেখো–

ক.
খ.
গ.

তুমি প্রতিদিন কোন কোন ধর্মীয় কাজ করে থাকো তা উল্লেখ করো–

আমাদের জীবনে অষ্টশীল

অভিজিৎ বড়ুয়া একজন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। সে প্রতিদিন বাড়িতে মা-বাবার সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা পঞ্চশীল গ্রহণ করে। শীল সম্পর্কে জানতে সে খুবই আগ্রহী। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার মা-বাবার কাছ থেকে পঞ্চশীলের অর্থ ও গুরুত্ব জেনে সে সর্বদা পঞ্চশীল অনুশীলন করার চেষ্টা করে। একদিন তাদের পরিবারে আসন্ন শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা পালনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। অভিজিৎ বড়ুয়া তার মা-বাবার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে। মা-বাবা উভয়ে এ পূর্ণিমায় অষ্টশীল গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এতে অষ্টশীল গ্রহণের প্রতি অভিজিতের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সে মা-বাবার কাছ থেকে অষ্টশীল সম্পর্কে জানতে চাইল। তাঁরা এ বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিলেন। এতে অভিজিৎ খুবই খুশি হলো। সে বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে মা-বাবার সঙ্গে বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে অষ্টশীল গ্রহণ করতে ইচ্ছা পোষণ করল। তার আগ্রহ দেখে মা-বাবাও খুব খুশি হলেন। বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে অভিজিৎ মা-বাবার সঙ্গে যথারীতি সকালে বৌদ্ধ বিহারে গেল। বুদ্ধপূজা শেষে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ সমবেতভাবে অষ্টশীল গ্রহণের আহবান জানালেন। অষ্টশীল গ্রহণে ইচ্ছুক সকলে যথাযথভাবে পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের সামনে আসন গ্রহণ করলেন। অষ্টশীল প্রার্থনা ও গ্রহণের পূর্বে পূজনীয় বিহারাধ্যক্ষ ভন্তে অষ্টশীল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত দেশনা করলেন।

ভন্তে বললেন– মানুষের চরিত্র শুদ্ধ রাখার জন্য বুদ্ধ কতগুলো নিয়ম-নীতি বা বিধি-বিধান পালনের উপদেশ দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্মে এই নিয়ম-নীতিকে শীল বলা হয়। বৌদ্ধরা নানারকম শীল পালন করেন। যেমন- পঞ্চশীল, অষ্টশীল, পাতিমোক্ষ শীল ইত্যাদি। সাধারণত গৃহী বৌদ্ধরা প্রতিদিন পঞ্চশীল পালন করেন। পঞ্চশীলে পাঁচটি শীল বা নিয়ম আছে। তাই এ পাঁচটি শীলকে পঞ্চশীল বলে।

ধার্মিক গৃহী বৌদ্ধরা অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীল পালন করেন। অষ্টশীল পালনকারীরা পঞ্চশীলের সাথে আরোও তিনটি শীল পালন করেন। অর্থাৎ মোট আটটি শীল পালন করেন। অষ্টশীল পালনকালে উপবাস ব্রত পালন করতে হয়। তাই অষ্টশীলকে উপসথ শীলও বলা হয়। অষ্টশীল পালনে চিত্ত প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়। তাই অষ্টশীল পালন করা খুবই উত্তম। পূজনীয় ভন্তের দেশনা শুনে অভিজিৎ মুগ্ধ হলো। সেও তার মা-বাবার সঙ্গে অষ্টশীল গ্রহণ করতে মনস্থির করল।

চিত্র ৯: বৌদ্ধ বিহারে সমবেতভাবে অষ্টশীল গ্রহণ

অষ্টশীল প্রার্থনা

আদর্শ জীবন গড়ার জন্য শীল গ্রহণ ও পালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টশীল গ্রহণের পূর্বে গ্রহীতার পক্ষ হতে শীল প্রার্থনা করতে হয়। তাই ঐ দিন অষ্টশীল গ্রহণকারীদের পক্ষ হতে অভিজিৎ বড়ুয়ার পিতা যথাযথভাবে অষ্টশীল প্রার্থনা করলেন।

অষ্টশীল প্রার্থনা: পালি

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেনসহ অট্ঠঙ্গ সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেনসহ অট্ঠঙ্গ সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেনসহ অট্ঠঙ্গ সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

অষ্টশীল প্রার্থনা: বাংলা

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভন্তে, দ্বিতীয়বারও অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভন্তে, তৃতীয়বারও অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

অষ্টশীল প্রার্থনা শেষ হলো। ভন্তে এবার বললেন, 'যমহং বদামি তং বদেহি' (আমি যা বলছি তা বলুন)।

সকলে বললেন: আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে, বলছি)।

এরপরে ভন্তে তাদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের স্মরণে উপনীত করে নিম্নে উল্লেখিত অষ্টশীল প্রদান করলেন। তিনি একটি একটি করে শীল পালিতে আবৃত্তি করলেন। সকলে তাঁর মুখে মুখে উচ্চারণ করলেন। এভাবে সকলে অষ্টশীল গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন করলেন।

দলগতভাবে অষ্টশীল প্রার্থনা ভূমিকাভিনয় করে দেখাও (শ্রেণিতে বা শ্রেণির বাইরের কাজ)।

অষ্টশীল

অষ্টশীল: পালি

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরা-মেরেয মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৭. নচ্চ গীত বাদিত বিসুকদস্সন মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মন্ডন বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৮. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

পালিতে অষ্টশীল গ্রহণ করার পর ভন্তে বাংলায় সেগুলো অনুবাদ করে ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দিলেন।

অষ্টশীল: বাংলা

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫. সুরা ও মাদকজাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৭. নাচ, গান, বাদ্য, উৎসব, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ, লেপন, বিভূষণকরণ থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৮. উচ্চশয্যায় ও মহাশয্যায় (আরামদায়ক শয্যা) শয়ন থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

তারপর সকলের মঙ্গল কামনা করে ভিক্ষুসংঘ সূত্রপাঠ করেন। সূত্রপাঠ শেষ হলে সকলে সমস্বরে তিনবার সাধু দিয়ে ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করেন।

জোড়ায় অথবা নিজে অষ্টশীল বাংলায় শুদ্ধ করে লেখো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করতে পারো।

প্রাত্যহিক জীবনে অষ্টশীল পালন করেছেন এমন কাউকে তুমি কি কি সহযোগিতা/সেবা করেছ তা নিচের ছকে লেখো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করতে পারো।

দলগতভাবে পোস্টার পেপারে অষ্টশীল ও পঞ্চশীলের মৌলিক পার্থক্যগুলো উপস্থাপন করো–

অষ্টশীল পালনের নিয়ম ও সুফল

অষ্টশীল পালনের নিয়ম

উপোসথ দিবসে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হয়। স্নান সেরে পরিষ্কার পোশাক পরিধান করতে হয়। পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বৌদ্ধ বিহারে যেতে হয়। সর্বদা ত্রিরত্নকে স্মরণ করতে হয়। বুদ্ধপূজা শেষে বিহারে অবস্থানরত ভিক্ষুর সামনে হাঁটু ভাঁজ করে করজোড়ে বসতে হয়। কাছে বৌদ্ধ বিহার না থাকলে বাসায় বা বাড়িতে অষ্টশীল গ্রহণ করা যায়।

অষ্টশীল পালনের সুফল

শীলকে সকল কুশল কর্মের ভিত্তি বলা হয়। শীলবান ব্যক্তির আচরণ সবসময় সংযত হয়। শীল হলো পারমী পূরণের একটি অঙ্গ। শীল পালনকারীর জীবন বিশুদ্ধ ও পুণ্যময় হয়। শীল অনুশীলনের দ্বারা আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, জীবে দয়া প্রভৃতি গুণ অর্জন করা যায়। ফুলের সুগন্ধ বাতাসের অনুকূলে প্রবাহিত হয়, কিন্তু শীলের প্রভাব বাতাসের অনুকূল-প্রতিকূল উভয়দিকে প্রবাহিত হয়। তাই প্রত্যেককে কায়মনোবাক্যে অষ্টশীল গ্রহণ ও পালন করা উচিত। আদর্শ জীবন গড়ার লক্ষ্যে প্রাত্যহিক জীবনে অষ্টশীল অনুশীলন ও চর্চা একান্ত অপরিহার্য। আদর্শ পরিবার ও সমাজ গড়ে তুলতে হলে সততা, স্বচ্ছতা, সদাচার, পরোপকার, পরমতসহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধাবোধ, প্রভৃতি ভালো গুণের অধিকারী হতে হয়। যথাযথভাবে অষ্টশীল অনুশীলন ও চর্চা দ্বারাই কেবল এসব গুণ অর্জন করা সম্ভব।

অষ্টপরিষ্কার দান

মংহ্লাচিং মারমা একজন চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার মধ্যে দান চেতনা প্রবল। গরিব, অসহায় মানুষকে সে সাহায্য দিয়ে আনন্দবোধ করে। পূজনীয় ভিক্ষুসংঘকে সে সশ্রদ্ধচিত্তে দান দিয়ে থাকে। বিভিন্ন রকম দান সম্পর্কে তার যথেষ্ট ধারণা রয়েছে। তার সহপাঠীরা একদিন তার কাছ থেকে দান সম্পর্কে জানতে চাইল। তখন সে অষ্টপরিষ্কার দানের কথা তার সহপাঠীদের জানাল। সে বলল, অষ্টপরিষ্কার দানে আট প্রকার নির্দিষ্ট দ্রব্য দান করা আবশ্যক। 'অষ্টপরিষ্কার' শব্দটি অষ্ট এবং পরিষ্কার এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। অষ্ট শব্দের অর্থ আট এবং পরিষ্কার-এর অর্থ হলো ভিক্ষুদের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় বস্তু। ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় আটটি নির্দিষ্ট উপকরণ বা বস্তু যে দান অনুষ্ঠানে ভিক্ষুসংঘকে দান করা হয় তাকে অষ্টপরিষ্কার দান বলে। অষ্টপরিষ্কার দানের আটটি দানীয় সামগ্রী হলো: সংঘাটি, উত্তরাসংঘ, অন্তর্বাস, পিণ্ডপাত্র, ক্ষুর, সুচ-সুতা, কটিবন্ধনী ও জল ছাকুনি। অষ্টপরিষ্কার দান অতি উত্তম দান। এগুলো পূজনীয় ভিক্ষুসংঘের অতীব নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। ভিক্ষুসংঘ হলেন সংসারত্যাগী। তাঁরা দানের দ্বারা সাধারণভাবে জীবনযাপন করে থাকেন। তাই ভিক্ষুসংঘকে শ্রদ্ধা-চিত্তে অষ্টপরিষ্কার দান দেয়া উচিত। মংহ্লাচিং এর কথা শুনে সহপাঠীরা ভীষণ খুশি হলো।

চিত্র ১০: অষ্টপরিষ্কার দানের উপকরণ

অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়ম

অষ্টপরিষ্কার দানের নিয়ম প্রায় সংঘদানের অনুরূপ। অষ্টপরিষ্কার দানের গাথাটি নিম্নরূপ:

ভন্তে (সংঘ), ইদং মে অট্ঠ পরিক্খারং দানানুভাবেন অনাগতে এহি ভিক্খু ভাবায নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু।

দুতিযম্পি, ইদং মে অট্ঠ পরিক্খারং দানানুভাবেন অনাগতে এহি ভিক্খু ভাবায নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু।

ততিযম্পি, ইদং মে অট্ঠ পরিক্খারং দানানুভাবেন অনাগতে এহি ভিক্খু ভাবায নিব্বানস্স পচ্চযো হোতু।

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, আমার এই অষ্টপরিষ্কার দানের প্রভাবে ভবিষ্যতে ঋদ্ধিময়, এস ভিক্ষুর মতো উপসম্পদা লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্তির হেতু হোক।

দ্বিতীয়বার, ভন্তে, আমার এই অষ্টপরিষ্কার দানের প্রভাবে ভবিষ্যতে ঋদ্ধিময়, এস ভিক্ষুর মতো উপসম্পদা লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্তির হেতু হোক।

তৃতীয়বার, ভন্তে, আমার এই অষ্টপরিষ্কার দানের প্রভাবে ভবিষ্যতে ঋদ্ধিময়, এস ভিক্ষুর মতো উপসম্পদা লাভ করে নির্বাণ প্রাপ্তির হেতু হোক।

অষ্টপরিষ্কার দানের সুফল

যেকোনো দাতা বা দায়ক ইচ্ছা করলে এই আট রকম দানীয় বস্তু সংগ্রহ করে বাড়িতে অথবা বিহারে নিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধাচিত্তে ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করতে পারেন। অষ্টপরিষ্কার দান অতি উত্তম দান। এ দানের মাধ্যমে দায়ক-দায়িকারা মহাপুণ্যফল লাভ করেন। অষ্টপরিষ্কার দানের ফলে ভিন্ন ভিন্ন আটটি ফল লাভ করা যায়। যেমন–

১. সঙ্ঘাটি, উত্তরাসংঘ এবং অন্তর্বাস ভিক্ষুর পরিধেয় এই তিনটি বস্ত্রকে বলা হয় ত্রিচীবর। এ ত্রিচীবর দানের ফলে দাতা জন্ম-জন্মান্তরে কখনো বস্ত্রাভাব বোধ করেন না।
২. পিন্ডপাত্র দান করলে দাতা জন্মে জন্মে বিত্তশালী হন।
৩. ক্ষুর দানের ফলে দাতা সর্বদা প্রজ্ঞাবান হয়ে জন্ম নেন।
৪. সুচ-সুতা দান করলে দাতা বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হন।
৫. কটিবন্ধনী দানের ফলে দাতা দীর্ঘায়ু হন।
৬. জল ছাকুনী দান করে দাতা নির্ভীক, নিরোগ ও সুশ্রী দেহধারী হন।

এছাড়া এই দানের ফলে দায়ক-দায়িকা জন্ম-জন্মান্তরে জ্ঞানী, বহু শাস্ত্রবিদ ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়। এ কারণে প্রত্যেক বৌদ্ধধর্ম অনুসারীর জীবনে অন্তত একবার অষ্টপরিষ্কার দান করা উচিত।

অষ্টপরিষ্কার দানের মানবিক দিক

অষ্টপরিষ্কার দান কোনো সাধারণ দান নয়। অষ্টপরিষ্কার দানের আটটি বস্তুর পৃথক পৃথক মূল্য রয়েছে। বস্তুগুলো খুব সাধারণ মনে হলেও শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এগুলোর মূল্য অপরিসীম। একজন ভিক্ষুর জীবন ধারণের জন্য এগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া, এ দানের মাধ্যমে একজন মানুষ কীভাবে কম উপকরণের দ্বারা বেঁচে থাকতে পারে সে শিক্ষাও আমরা পাই। এতে মানুষের চাহিদা নিবৃত্তির চর্চা হয় এবং মানবিক চেতনা জাগ্রত হয়। তাই এই দান কর্মের সঙ্গে মানুষের মানবিক চেতনা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আমাদের সমাজে কতগুলো মানুষ আছে যারা অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। একজনের দানের দ্বারা আরেকজনের অপরিসীম উপকার সাধিত হয়। অষ্টপরিষ্কার দানের মাধ্যমে আমরা সেই শিক্ষাই পেয়ে থাকি। অষ্টপরিষ্কার দানের দ্বারা মানুষের মানবিক গুণাবলি অর্জিত হয়। দাতার মধ্যে ত্যাগ, উদারতা, সহমর্মিতা, পরোপকার ও স্বদেশপ্রেমের মনোভাব গড়ে ওঠে। অন্যের

দুঃখকষ্ট বোঝার আন্তরিক মনোভাব গড়ে ওঠে। এর প্রভাব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। যার দ্বারা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

তোমার দেখা অষ্টপরিষ্কার দানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লেখো–

** প্রয়োজনে আলাদা কাগজে লিখে বইয়ের এ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করতে পারো।

ছকের আলোকে একজন ভিক্ষুর জীবনে অষ্টপরিষ্কার দানের উপকরণগুলোর কোনটি কী কাজে লাগে সে সম্পর্কে লেখো–

অষ্টপরিষ্কার দানের উপকরণ	কী কাজে ব্যবহার করা হয়
১. সংঘাটি	ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র।
২. উত্তরাসংঘ	ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্রের উপরে বাম কাঁধে থাকে।
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	
৭.	
৮.	

যথাযথ শব্দ দিয়ে নিম্নের চিত্রটি পূরণ করো–

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম ও কর্মফল

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যা আছে–

- কর্ম ও কর্মফল
- কুশল কর্মের ফল
- অকুশল কর্মের পরিণতি

কর্ম ও কর্মফল

কর্ম বলতে কোনো কাজ করাকে বোঝায়। তবে, কাজ শুধু শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে হয় তা নয়, কাজের উৎপত্তিস্থল মন। মনের ভাবনাও একটি কাজ। কারণ যেকোনো কিছু আগে আমরা মনে সিদ্ধান্ত নিই, তারপর শরীরের মাধ্যমে সম্পাদন করি। মন শান্ত না হলে আমরা অস্থির থাকি। মনের শান্তিই প্রকৃত শান্তি। তাই বুদ্ধ মনের ভাবনাকেও কাজ করা হিসেবে গণ্য করেন। অর্থাৎ মনের চিন্তা বা ভাবনাও একটি কর্ম। এভাবে মানুষ সব সময় ভালো-মন্দ নানা রকম কাজ বা কর্ম করে চলেছে। কাজ করার আগে কোন কাজ ভালো আর কোন কাজ মন্দ কখনো চিন্তা করে দেখা হয় না। অথচ অনেক কাজের পরিণতিতে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হয়। এ বিষয়ে তোমাদের একটি ঘটনা বলি। ঘটনাটি হলো এরকম–

গ্রামের একটি বিদ্যালয়ের কথা। আনন্দের সঙ্গে সকলে নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম করে। একদিন শিক্ষক টিফিন বিরতির পর শ্রেণিকক্ষে চলে এসেছেন। সবাই আছে কিন্তু ঋভু ও শাক্য নেই। ওরা কোথায় গেল, শিক্ষক জানার চেষ্টা করছেন। এমন সময় ঋভু খবর নিয়ে এলো, প্রধান শিক্ষকের কক্ষে শাক্যকে ডাকা হয়েছে। কারণ সে অনুমতি না নিয়ে বিদ্যালয়ের গাছের আম পাড়তে গিয়েছিল। ঋভুর কাছে এ কথা শুনে ক্লাসের সবার মন খারাপ হলো। তারা বলাবলি করতে লাগল, কেন শাক্য এমন কাজ করল? তারা অপেক্ষা করছে, কখন শাক্য আসবে।

কিছুক্ষণ পর শাক্য এলো। কী হয়েছে, জিজ্ঞেস করলে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি একটি অন্যায় কাজ করেছি। অনুমতি না নিয়ে আমগাছে উঠেছি। স্যার বললেন, অন্য কারো জিনিস নিতে গেলে আগে অনুমতি নিতে হয়। অনুমতি ছাড়া নিলে অন্যায় হয়। স্যার আরো বললেন, গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আঘাতও পেতে পারো। গাছে চড়া একটি বিপজ্জনক কাজ। একটু অসতর্ক হলেই মহাবিপদ হতে পারে। তাই স্যার আমাকে এ ধরনের কাজ আর না করতে বলেছেন।

শাক্যর কথা শুনে শ্রেণিশিক্ষক বললেন, তুমি কাজটা ঠিক করোনি। এমনটা আর কখনো করবে না। শিক্ষক তখন সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, এ ঘটনা থেকে তোমরা কী জানলে?

সুকন্যা বলল, শাক্য মন্দ কাজ করেছে তাই সে কষ্ট পাচ্ছে। তাই সবসময় ভালো কাজ করতে হয়।

শিক্ষক বললেন, ঠিক।

তুমি কী কী ভালো কাজ করেছো তার একটি তালিকা তৈরি করো–

ক্রম	ভালো কাজের নাম
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইচ্ছে করলেই আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারি। আর এ 'ভালো কাজ'কে বৌদ্ধধর্মে 'কুশল কর্ম' এবং 'মন্দ কাজ'কে 'অকুশল কর্ম' বলে।

কুশল কর্ম

কুশল শব্দের অর্থ ভালো, শুভ, সৎ, মঙ্গল, কল্যাণ ইত্যাদি। লোভ, হিংসা, ঘৃণা ত্যাগ করে কুশল চিত্ত বা মন দিয়ে কোনো ভালো কাজ করাকে কুশল কর্ম বলে।

চিত্র ১১: গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা

কর্মের দ্বার তিনটি। যথা– কায় দ্বার, বাক্য দ্বার ও মন দ্বার। এ তিনটির মাধ্যমে আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়। কায় বা শরীর দিয়ে, বাক্য বা কথা দিয়ে ও মন দিয়ে যে সকল কাজ সম্পন্ন হয় তাকে কর্ম বলে। আর সৎকর্ম বা ভালো কাজকে কুশল কর্ম বলে। যেমন– অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকা, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, সত্য কথা বলা, অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং অন্যের সুখে সুখী হওয়া, অন্যকে সহযোগিতা করা, নিজ ধর্মের নিয়ম-নীতি সুশৃঙ্খলভাবে পালন করা, দেশকে ভালোবাসা ইত্যাদি।

প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমনই ফল পাবে। ভালো কাজ করলে ভালো ফল, মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল। এছাড়াও ভালো কাজ করলে মন ভালো হয়। মন ভালো হলে শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এর ফলে সহজে যেকোনো কাজে সফলতা লাভ করা যায়। নিজের জীবন সুশৃঙ্খলভাবে সাজাতে পারে। সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ গৌতম বুদ্ধ। তিনি আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকল প্রাণির মঙ্গালের জন্য আজীবন কাজ করেন। এজন্য আজও তিনি সকলের স্মরণীয় ও পূজনীয়। বুদ্ধের এ শিক্ষা গ্রহণ করে সর্বদা কল্যাণকর কাজ করা উচিত। কারণ একমাত্র কুশল কর্ম দ্বারাই ব্যক্তি নিজের, পরিবারের ও সমাজের সুনাম রক্ষা করতে পারে। এর পাশাপাশি কুশলকর্মের মাধ্যমে সকলের মঙ্গালও সাধিত হয়। ফলে সর্বাঙ্গীণভাবে দেশেরও মঙ্গাল হয়।

তোমার করা একটি ভালো কাজের বর্ণনা নিচের ছকে লেখো–

অকুশল কর্ম

যা কিছু মন্দ কাজ তা অকুশল কর্ম। যেকোনো কিছুর প্রতি অতিলোভ করা, কাউকে হিংসা করা, ঘৃণা করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, যেকোনো প্রাণিকে আঘাত করা, মন্দ কথা বলে কাউকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি অকুশল কর্ম। আমরা যখন খারাপ কাজ করে খারাপ ফল পাই তখন আমাদের মন খারাপ হয়। আমাদের মন খারাপ হলে খাওয়া ও ঘুম ঠিক হয় না। তখন আমাদের শরীর অসুস্থ হয়। ফলে আমরা আর আনন্দের সঙ্গে কোনো কাজ করতে পারি না। কাজ না করলে জীবনে উন্নতি হবে না। ফলে-নিজের, পরিবারের ও সমাজের উন্নতি হবে না। তাছাড়াও যে ব্যক্তি অকুশল কর্ম করে সে সমাজে অপমানিত হয়। তাকে কেউ সম্মান করে না। সবাই সব জায়গায় তার নিন্দা করবে।

যেমন– আমরা সম্রাট অশোকের কথা জানি। তিনি সমগ্র ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করে রাজ্য জয় করেছিলেন। রাজ্য জয়ের লোভে তাঁর মধ্যে কোনো মায়া মমতা কাজ করেনি। প্রচন্ড হিংসা ও হিংস্রতা দিয়ে তিনি এ জয় লাভ করেছিলেন। তার হিংসাত্মক কার্যক্রমের জন্য তাকে চন্ডাশোক বলা হতো। পরবর্তী সময়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এভাবে হিংসা, লোভ, রক্তপাত, হত্যার মাধ্যমে কখনো ভালো কিছু হয় না। তাই তিনি পরে বুদ্ধের অহিংসা ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারে সবরকম সহযোগিতাও করেছিলেন। তাই আমাদের কুশল কর্ম সম্পাদনের জন্য সচেতন হতে হবে। তা না হলে অকুশল কর্মের ফল সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

চিত্র ১২: ক

চিত্র ১২: খ

উপরের ছবি দুটির মধ্যে কুশল কাজ কোনটি? কুশল কাজটি সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখো–

নং	কুশল কর্ম
১.	
২.	
৩.	

সতীর্থ মূল্যায়ন: নিচের ছকে উল্লেখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখে তা তোমার সহপাঠীর মাধ্যমে যাচাই করো।

প্রশ্ন	উত্তর
অষ্টশীল কী, লেখো।	
অষ্টশীল পালনের গুরুত্ব লেখো।	
তোমার এলাকা, পাড়া, গ্রাম, পরিবারে উপোসথশীল গ্রহণকারী কয়েকজন ব্যক্তির নাম লেখো।	
অষ্টপরিষ্কার দানের উপকরণের নাম লেখো।	
মানবিক গুণাবলির পাঁচটি উদাহরণ দাও।	
পাঁচটি অকুশল কর্মের নাম লিখে অকুশল কর্মের পরিণতি কী কী হতে পারে লেখো।	
তুমি করেছ এমন তিনটি কুশল কর্মের নাম লেখো।	

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই:

১। উপোসথ শব্দের অর্থ কী?
ক) উপবাস খ) অনাহার গ) একাহার ঘ) পানাহার।

২। শীলের প্রভাব কোন দিকে প্রবাহিত হয়?
ক) বাতাসের অনুকূলে খ) বাতাসের প্রতিকূলে
গ) বাতাসের অনুকূল-প্রতিকূল উভয়দিকে ঘ) বাতাসে প্রবাহিত হয় না।

৩। কুশল অর্থ কী?
ক) লাভ খ) সত্য গ) সুন্দর ঘ) ভালো

৪। সম্রাট অশোককে কেন চন্ডাশোক বলা হতো?
ক) হিংসাত্মক কাজের জন্য খ) খারাপ কাজের জন্য
গ) অকুশল কাজের জন্য ঘ) মিথ্যা দৃষ্টির জন্য

৫। সম্রাট অশোক পরে কোন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?
ক) হিন্দুধর্ম খ) জৈনধর্ম গ) বৌদ্ধধর্ম ঘ) খ্রিষ্টধর্ম

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি:

১। আটটি শীলের সমন্বয়ে গঠিত শীলকে _____ বলে।

২। শীলকে সকল কুশল কর্মের _____ বলা হয়।

৩। অষ্টপরিষ্কার দানের দ্বারা মানুষের _____ গুণাবলি অর্জিত হয় ।

৪। ভিক্ষুর পরিধেয় সঙ্ঘাটি, উত্তরাসংঘ এবং অন্তর্বাস এই তিনটি বস্ত্রকে একত্রে _____বলে।

৫। শীল হলো _____ পুরণের একটি অঙ্গ।

গ) মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। অষ্টশীল গ্রহণের পূর্বে গ্রহীতার পক্ষ হতে	ক) সুশৃঙ্খলভাবে বৌদ্ধবিহারে যেতে হয়।
২। প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকবো	খ) কুশল কর্ম বলে।
৩। পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে	গ) শীল প্রার্থনা করতে হয়।
৪। সূচ-সুতা দান করলে দাতা	ঘ) এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫। সৎ কর্ম বা ভাল কাজকে	ঙ) বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হন।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। অষ্টশীল পালনে চিত্ত প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। আটটি শীলের সমন্বয়ে গঠিত শীলগুচ্ছকে বলা হয় অষ্টশীল। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। শীলবান ব্যক্তির আচরণ সবসময় অসংযত হয়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। প্রত্যেককে কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। অষ্টপরিষ্কার দানের একটি দানীয় সামগ্রী হলো সাবান। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। অষ্টশীলকে উপোসথ শীল বলা হয় কেন?

২। অষ্টশীল প্রার্থনা বাংলায় লেখো।

৩। অষ্টপরিষ্কার দান কেন করা উচিত ?

৪। কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের পার্থক্য লেখো।

৫। কর্মের দ্বার কয়টি ও কী কী?

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। আদর্শ জীবন গঠনে অষ্টশীলের গুরুত্ব লেখো।

২। তোমার জীবনে অষ্টশীল পালনের সুফল ব্যাখ্যা করো।

৩। তোমার দেখা একটি অষ্টপরিষ্কার দান অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।

৪। তুমি কীভাবে কুশল কর্মের চর্চা করবে লেখো।

৫। সম্রাট অশোক কেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বর্ণনা দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

পূজা-উৎসব ও ঐতিহাসিক স্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূজা-উৎসব

এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যা আছে –

- বৌদ্ধদের নিত্যকরণীয় পূজা
- আহারপূজার নিয়ম
- পালি ও বাংলায় আহার ও পানীয়পূজা
- বুদ্ধ পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা
- অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসব
- ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান

বৌদ্ধদের নিত্যকরণীয় পূজা

তোমরা আগের শ্রেণিতে জেনেছ এমন কোনো পূজার কথা কি মনে পড়ে? যাতে তোমরা প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করে শ্রদ্ধাচিত্তে পূজা করেছিলে। অংশগ্রহণ করা কয়েকটি পূজার নাম মুখে মুখে বলো।

বৌদ্ধধর্মে নিত্যকরণীয় কিছু পূজা আছে। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে বৌদ্ধবিহার বা নিজ নিজ বাড়িতে প্রতিদিন এই পূজা করা হয়। বৌদ্ধরা ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পূজা করেন। নিত্য করণীয় এসব পূজার মধ্যে বুদ্ধপূজা, আহারপূজা, পানীয়পূজা, পুষ্পপূজা, প্রদীপপূজা, ধূপপূজা অন্যতম। এ অধ্যায়ে তোমরা আহারপূজা এবং পানীয়পূজা সম্পর্কে জানতে পারবে।

চিত্র ১৩: পূজা উৎসবে প্রদীপ ও ধূপপূজা

একক বা জোড়ায় আলোচনা করে বৌদ্ধদের নিত্যকরণীয় কয়েকটি পূজার নাম এবং সে পূজা কখন করতে হয় লেখো–

পূজার নাম	কখন করতে হয়
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

আহারপূজার নিয়ম

'পূজা' একটি পুণ্যকর্ম। পূজা শব্দের অর্থ হলো শ্রদ্ধা, ভক্তি, উপাসনা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপকরণ (ফুল, পানীয়, আহার ইত্যাদি) দিয়ে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাকে 'পূজা' বলে। পূজা করলে ত্রিরত্নের প্রতি মন প্রসন্ন হয়। মনের খারাপ চিন্তা দূর হয়। মন পবিত্র ও শান্ত

হয়। মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। ভালো কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়। তাই আমাদের সকলের সকাল-বিকাল 'বৌদ্ধবিহারে' গিয়ে বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে বা নিজ নিজ বাড়িতে বুদ্ধাসনের সামনে বসে বিভিন্ন পূজা করা উচিত। আমরা জেনেছি যে বৌদ্ধদের নিত্যকরণীয় কিছু পূজা আছে। আজ আমরা সেই নিত্যকরণীয় পূজার 'আহারপূজা' কীভাবে করতে হয় তার নিয়ম জানব।

চিত্র ১৪: আহারপূজা

বৌদ্ধরা প্রতিদিন বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আহারপূজা নিবেদন করেন। বেলা বারোটার পূর্বে আহারপূজা করতে হয়। যিনি পূজা করেন তাকে প্রথমে হাত-মুখ ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে হয়। তারপর আহারপূজার উপকরণগুলো সুন্দরভাবে থালায় সাজানো হয়। এরপর বাড়িতে বুদ্ধের আসনের সামনে বা বিহারে বুদ্ধমূর্তির সামনে বেদিতে সাজানো উপকরণ রাখা হয়। উপকরণ সাজানো হয়ে গেলে দু-হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসে পালি ভাষায় আহারপূজার উৎসর্গ গাথা আবৃত্তি করতে হয়। উৎসর্গ গাথা আবৃত্তির পর বুদ্ধকে বন্দনা করে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।

একক বা জোড়ায় আলোচনা করে পূজা করার পূর্বে যেসব কাজ করতে হয় তা মুকাভিনয় করে দেখাও।
আহার পূজার উৎসর্গ গাথা।

পালি

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায পতিগণ্হাতু উত্তমং।
দুতিয়ম্পি অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায পতিগণ্হাতু উত্তমং।
ততিয়ম্পি অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায পতিগণ্হাতু উত্তমং।

বাংলা অনুবাদ

হে ভন্তে! উপযুক্ত পূজার উপকরণ দিয়ে উত্তম আহার প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদের এ পূজা গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয়বার হে ভন্তে! উপযুক্ত পূজার উপকরণ দিয়ে উত্তম আহার প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদের এ পূজা গ্রহণ করুন।

তৃতীয়বার হে ভন্তে! উপযুক্ত পূজার উপকরণ দিয়ে উত্তম আহার প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদের এ পূজা গ্রহণ করুন।

দলগতভাবে আহারপূজা ভূমিকাভিনয় করো।

পানীয়পূজা

চিত্র ১৫: পানীয়পূজা

আহারপূজার ন্যায় বৌদ্ধরা প্রতিদিন পানীয়পূজাও নিবেদন করেন। সাধারণত সকাল ও সন্ধ্যায় পানীয়পূজা করা হয়। তবে পানীয়পূজা যেকোনো সময় করা যায়। প্রথমে একটি পাত্রে পানীয় জল বা ফলের রস বা শরবত রাখা হয়। এরপর বাড়িতে বুদ্ধের আসনের সামনে বা বিহারে বুদ্ধমূর্তির সামনে দু-হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসে পানীয়পূজার উৎসর্গগাথা পালি ভাষায় আবৃত্তি করতে হয়। উৎসর্গগাথা আবৃত্তির পর বুদ্ধকে বন্দনা করে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।

পানীয়পূজার উৎসর্গগাথা

পালি

অধিবাসেতু নো ভন্তে পানীযং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায পতিগণ্হাতু উত্তমং।

দুতিযম্পি অধিবাসেতু নো ভন্তে পানীযং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায পতিগণ্হাতু উত্তমং।

ততিযম্পি অধিবাসেতু নো ভন্তে পানীযং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায পতিগণ্হাতু উত্তমং।

বাংলা অনুবাদ

হে ভন্তে! উপযুক্ত পূজার উপকরণ দিয়ে উত্তম পানীয় প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদের এ পূজা গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয়বার হে ভন্তে! উপযুক্ত পূজার উপকরণ দিয়ে উত্তম পানীয় প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদের এ পূজা গ্রহণ করুন।

তৃতীয়বার হে ভন্তে! উপযুক্ত পূজার উপকরণ দিয়ে উত্তম পানীয় প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাদের এ পূজা গ্রহণ করুন।

‘আহারপূজা’ ও ‘পানীয়পূজা’র গাথা এককভাবে আবৃত্তি করো এবং পালি ও বাংলা ভাষায় নিচের ছকে লেখো–

পূজার নাম	পালি	বাংলা

আমরা এতক্ষণ জেনেছি যে আহারপূজা ও পানীয়পূজা করতে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ নিয়মের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অন্যতম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের পর উপকরণ সাজিয়ে বাড়িতে বুদ্ধাসনের সামনে বা বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধমূর্তির সামনে রেখে নতজানু হয়ে বসে যে পূজা করি সে পূজার উৎসর্গগাথা বলে পূজা নিবেদন করতে হয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা

বৌদ্ধ সম্প্রদায় কী কী পূর্ণিমা পালন করেন তা তোমরা আগের শ্রেণিতে পড়েছ, তাই না? নিশ্চয় তোমাদের তা মনে আছে। তোমরা কি কয়েকটি পূর্ণিমার কথা বলতে পারবে? চলো আজ আমরা বৌদ্ধদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণিমা বুদ্ধপূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমার কথা জেনে নিই। প্রথমে জানব বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা।

বুদ্ধ পূর্ণিমা

চন্দ্রের সঙ্গে পূর্ণিমার সম্পর্ক আছে তা আমরা সকলে জানি। আকাশে চাঁদ যখন পুরোপুরি উদিত হয়ে মায়াময় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে রাতের আঁধারকে লুকিয়ে রাখে তখন পূর্ণিমা হয়। বুদ্ধের জন্ম থেকে মৃত্যু (মহাপরিনির্বাণ) পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা কোনো না কোনো পূর্ণিমার সঙ্গে জড়িত। তাই বৌদ্ধ সম্প্রদায় যথাযথ মর্যাদায় প্রতিটি পূর্ণিমা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করেন। পূর্ণিমাকে ঘিরে বিভিন্ন উৎসবও পালিত হয়। বুদ্ধপূর্ণিমা বৌদ্ধদের প্রধান পূর্ণিমা ও ধর্মীয় উৎসব। কারণ এ পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ গৌতম লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন, বুদ্ধগয়ার মহাবোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধত্বলাভ করেন এবং কুশিনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কাছে এ দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দেশে এ দিন সরকারি ছুটি থাকে। জাতিসংঘ এ দিনটিকে 'বেসাখ ডে' হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমাদের দেশে প্রতিটি বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ঘরে ও বিহারে বুদ্ধপূজার আয়োজন করা হয়। এ দিন সকালে বা বিকেলে সকলের সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। বিহারে পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ সকলকে পঞ্চশীল ও অষ্টশীল প্রদান করেন। আয়োজন করা হয় ধর্মসভা। কোন কোন বিহারে শিশু-কিশোরদের জন্য আয়োজন করা হয় চিত্রাঙ্কন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা। ছোটো-বড়ো সকলে এ দিনটি আনন্দ, উৎসাহ এবং ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপন করে থাকেন।

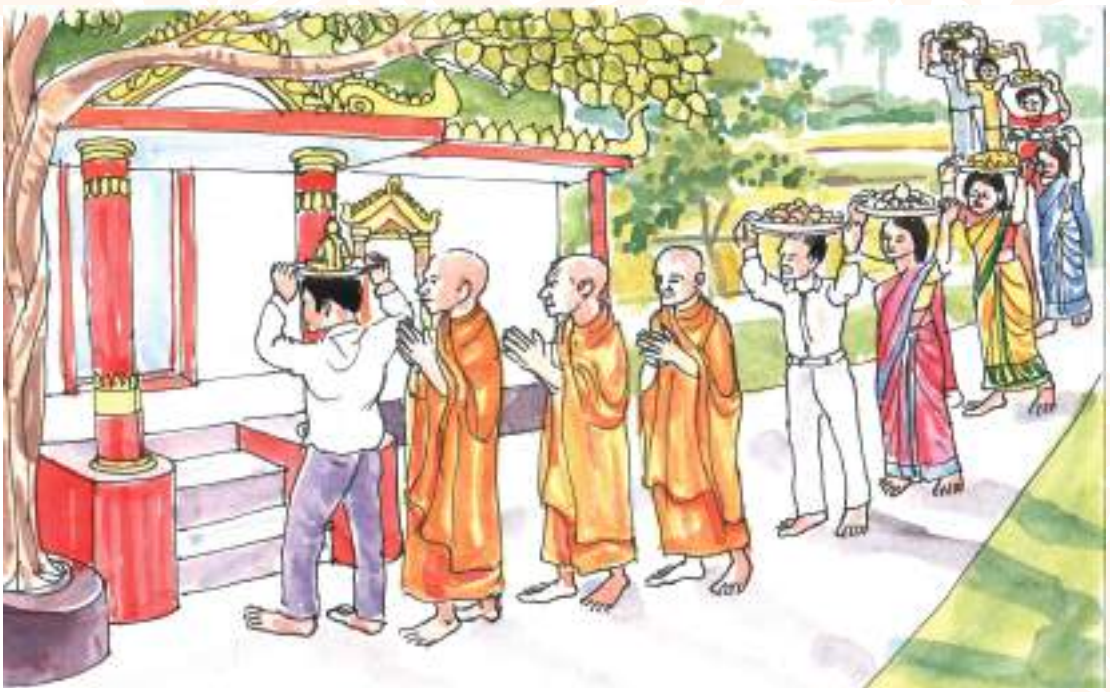

চিত্র ১৬: বুদ্ধপূর্ণিমা উৎসব

বুদ্ধপূর্ণিমায় অংশগ্রহণ করে তোমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সে সম্পর্কে লেখো–

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণিমা। কারণ বুদ্ধের জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ পূর্ণিমার সঙ্গে জড়িত। ঘটনাগুলো হলো মাতৃগর্ভে সিদ্ধার্থের প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম ধর্মপ্রচার।

মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি

প্রতিসন্ধি মানে মাতৃগর্ভে ভ্রুণ সৃষ্টি হওয়া। রাণী মহামায়ার গর্ভে সিদ্ধার্থ প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেছিলেন আষাঢ়ী পূর্ণিমার উজ্জ্বল তিথিতে।

গৃহত্যাগ

সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মের পর আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে ওঠেন। বড়ো হওয়ার পর তিনি নগর ভ্রমণে বের হন। নগর ভ্রমণে গিয়ে তিনি জরাগ্রস্ত, বার্ধক্যে জর্জরিত লোক, মৃতব্যক্তি এবং সন্ন্যাসী দেখে উপলব্ধি করেন যে এ জীবন দুঃখময়। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করে ধ্যানসাধনা করবেন বলে চিন্তা করেন। সে চিন্তা থেকে তিনি তাঁর সাথী ছন্দককে নিয়ে ঘোড়া কন্থকের পিঠে চড়ে গৃহত্যাগ করেন। যে রাতে তিনি গৃহত্যাগ করেন, সে রাত ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত।

ধর্মপ্রচার

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করার পর তাঁর নতুন ধর্মপ্রচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি সারনাথের ঋষিপত্তন মৃগদাব স্থানে যান। সেখানে পাঁচজন সন্ন্যাসীর কথা তাঁর মনে পড়েছে যাঁরা বুদ্ধের সন্ন্যাস জীবনের সঙ্গী ছিলেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি প্রথম সেই পাঁচজন সন্ন্যাসীর নিকট ধর্মপ্রচার করেন। এ পাঁচজনই ছিলেন বুদ্ধের কাছে দীক্ষা পাওয়া প্রথম ভিক্ষু।

মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ এবং ধর্মপ্রচার এ তিনটি ঘটনা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংগঠিত হয়েছিল বলে বৌদ্ধ সম্প্রদায় মহাসমারোহে আষাঢ়ী পূর্ণিমা পালন করে থাকেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা লেখো–

অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসব

তোমরা নিজ ধর্মের উৎসব ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী বন্ধুদের সঙ্গে তাদের কোন কোন ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করেছ? কীভাবে সে উৎসব উপভোগ করেছ? সে অভিজ্ঞতা তোমাদের নিশ্চয় স্মরণে আছে।

আমাদের যেমন বুদ্ধ পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসব আছে অন্যান্য ধর্মেরও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব আছে। ইসলাম ধর্ম অনুসারীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো 'ঈদ-উল-ফিতর', এবং 'ঈদ-উল-আযহা'। সনাতন বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো 'দুর্গাপূজা', 'স্বরস্বতী পূজা' ও 'জন্মাষ্টমী'। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'বড়দিন' ও 'ইস্টার সানডে'। আমাদের বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সকল ধর্মের লোক শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে। একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে এবং ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করে। একে অন্যের ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করলে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও মিত্রতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকে নিজ ধর্ম, ধর্মীয় উৎসব এবং অনুষ্ঠানকে ভালোবাসে। তাই নিজ ধর্মের পাশাপাশি অন্যের ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

চিত্র ১৭: প্রবারণা

চিত্র ১৮: ঈদ

চিত্র ১৯: দুর্গাপূজা

চিত্র ২০: বড়দিন

একক বা বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে অন্যান্য ধর্মের কয়েকটি উৎসবের নাম লেখো–

ইসলাম ধর্ম	হিন্দু ধর্ম	খ্রিষ্টান ধর্ম

ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি দেশ। এ দেশে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একত্রে মিলেমিশে বসবাস করে আসছেন। যেহেতু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব সেহেতু মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হয়। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করে। সকল ধর্মের লোক মিলেমিশে সমাজে বাস করলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, একে অপরের বিপদে-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে সমাজ দিন দিন উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু কোনো কারণে ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট হলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে সমাজের সকল ধরনের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। তাই আমাদের সকলের উচিত সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান বজায় রাখা।

‘ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান সমাজে কল্যাণ বয়ে আনে’– এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করো–

পক্ষদল	বিপক্ষদল
১। দলনেতার নাম	১। দলনেতার নাম
২। প্রথম বক্তা	২। প্রথম বক্তা
৩। দ্বিতীয় বক্তা	৩। দ্বিতীয় বক্তা

আমাদের যেমন ধর্মীয় উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান আছে তেমনি অন্যান্য ধর্মেরও ধর্মীয় উৎসব ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আছে। যেগুলো **স্ব-স্ব** ধর্মাবলম্বীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিচিত্তে এবং উৎসাহের সঙ্গে পালন করে থাকে। প্রত্যেক ধর্মের উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠান নিজ নিজ ধর্মীয় উপলব্ধি থেকে মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণে আমাদের প্রত্যেকের একে অন্যের ধর্মের উৎসব ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং একে অপরের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করা উচিত। এতে আমাদের মধ্যে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও সহমর্মিতা জাগ্রত হয়।

ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তোমার করণীয়সমূহ পোস্টার পেপারে লেখো (একক কাজ)–

দল-১: পোস্টার	দল-২: পোস্টার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক স্থান

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যা আছে –

- বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক স্থান পরিচিতি
- ময়নামতি ও পাহাড়পুর
- নালন্দা ও তক্ষশীলা
- ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা
- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহাসিক স্থান পরিচিতি

চিত্র ২১: বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান

ঐতিহাসিক স্থান: ময়নামতি ও পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার

ধর্মের সঙ্গে সবসময় কিছু স্থানের সম্পর্ক থাকে। জগতের সকল ধর্মেই এই সম্পর্ক রয়েছে। তেমনি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেও রয়েছে অনেক স্থানের সম্পর্ক। এগুলোর মধ্যে যে স্থানগুলো মহামানব বুদ্ধের মহাজীবনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত সে স্থানগুলোকে সাধারণ অর্থে তীর্থস্থান বলে। এছাড়া, যে স্থানসমূহ বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সে স্থানসমূহকে বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান বা বৌদ্ধ ঐতিহ্য বলে। বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বৌদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। নিচে কয়েকটি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানের পরিচয় প্রদান করা হলো।

ময়নামতি

চিত্র ২২: শালবন বিহার

ময়নামতি কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। এর পূর্ব নাম 'রোহিতগিরি'। এখানে ঐতিহাসিক একটি স্থান রয়েছে। এটি শালবন বিহার নামে প্রসিদ্ধ। এর মূল পরিচয় 'শালবন বৌদ্ধবিহার'। শালবন বিহারের আশে-পাশে আরও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে। এগুলোরও সামাজিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। এগুলো প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে দেববংশের চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব এ বিহারটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে কয়েকবার এর সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়। এতে ১১৫টি কক্ষ আছে। কক্ষের সামনে টানা বারান্দা রয়েছে। এই কক্ষসমূহে একেকজন ভিক্ষু ধ্যান করতেন। প্রার্থনা ও ধর্মালোচনার জন্য একটি বড় হলঘর রয়েছে। এটি শুধু বিহার ছিল না। সেসময় এটি ছিল বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল।

শাল ও গজারি বৃক্ষের বনের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় বিহারটি শালবন নামে পরিচিত। এছাড়াও এ বিহারের নিকটবর্তী গ্রামের নাম শালবনপুর।

পাহাড়পুর বৌদ্ধ মহাবিহার

চিত্র ২৩: সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহার

পাহাড়পুর বৌদ্ধ মহাবিহার বলতে পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বৌদ্ধ মহাবিহারকে বোঝানো হয়। এটি বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। এটি একটি ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই ঐতিহাসিক স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণ করে। এটি পাল রাজাদের আমলে প্রতিষ্ঠিত একটি বৌদ্ধ মহাবিহার। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে এই বৌদ্ধ মহাবিহারের বিশেষ অবদান রয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য এটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত। এখানে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ছাড়াও বেদ, পুরাণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞানসহ বহু বিষয়ে পাঠ দানের ব্যবস্থা ছিল।

প্রাচীন এই বৌদ্ধ মহাবিহারটি ধ্বংস হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। বহু বছর পর এটি অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়। মাটি খনন করে এই মহাবিহার আবিষ্কারকালে প্রাচীন অনেক মূল্যবান বুদ্ধমূর্তি, তৈজসপত্র, মুদ্রা ইত্যাদি নানা রকম ব্যবহার সামগ্রী পাওয়া যায়। সেখানে একটি জাদুঘর তৈরি করে এগুলো রাখা হয়েছে।

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ইউনেস্কো এই ঐতিহাসিক স্থানকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন এটি শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের একটি অনন্য মূল্যবান প্রাচীন সম্পদ।

তুমি কি কোনো বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানে বেড়াতে গিয়েছ কখনো? সেখানে গিয়ে তুমি যা দেখেছো সে সম্পর্কে লেখো–

ঐতিহাসিক স্থান: নালন্দা ও তক্ষশীলা

নালন্দা মহাবিহার

চিত্র ২৪: নালন্দা

নালন্দা মহাবিহার একটি ঐতিহাসিক বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকলে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। বর্তমানে এটি ভারতের বিহার প্রদেশে অবস্থিত। ধর্ম-দর্শনের পাশাপাশি বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হতো। এটি মূলত একটি আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই মহাবিহার 'নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়' নামেও পরিচিত।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক ইতিহাস জানা কঠিন। তবে ধারণা করা হয় যে, প্রথমে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ধ্যান-সাধনার জন্য এ অঞ্চলে বিহার নির্মাণপূর্বক বসবাস শুরু করেন। এই বিহারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ পায় গুপ্ত যুগে। রাজা কুমারগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা মহাবিহারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠে।

তক্ষশীলা

চিত্র ২৫: তক্ষশীলা

তক্ষশীলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। তক্ষশীলা মূলত এলাকার নাম। সেই নামেই প্রাচীন এই শিক্ষা কেন্দ্রটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। সিন্ধু নদীর পূর্ব তীরে এর অবস্থান। এই এলাকাটি ছিল প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। এটির বর্তমান অবস্থান পাকিস্তানে। পাঞ্জাব প্রদেশের রাওয়ালপিন্ডি জেলায় এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান। রাওয়ালপিন্ডির অবস্থান রাজধানী ইসলামাবাদের কাছাকাছি। তক্ষশীলা এই শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এই প্রত্নসম্পদটি বিশ্বসভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

প্রাচীন ভারতের প্রায় সর্বত্র জ্ঞানী ও গুণী মানুষ এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এখানে বৌদ্ধধর্মসহ বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বহু বিষয়ের চর্চা হতো। বিখ্যাত ব্যাকরণ

বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত পাণিনি ও রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক জীবক এই তক্ষশীলায় পড়ালেখা করেছেন। এটি ছিল বর্তমানকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

তোমরা ময়নামতি, পাহাড়পুর, নালন্দা ও তক্ষশীলা নামে চারটি দল গঠন করে চার দল চার রঙের পোস্টার পেপারে নিজ দলের যে নাম সে বিষয়ের বর্ণনা লিখে উপস্থাপন করো।

ময়নামতি	পাহাড়পুর	নালন্দা	তক্ষশীলা

ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব

ঐতিহাসিক স্থানগুলো ইতিহাসের অমূল্য নিদর্শন। এগুলো শুধু ধর্মীয় সম্পদ নয়, এগুলো জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্যও বটে। এগুলোর সামাজিক-সাংস্কৃতিক মর্যাদা অপরিসীম। শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে এই ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থানগুলোর বিশেষ প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই স্থানসমূহ পরিদর্শন করে এগুলোর গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারবে। দর্শনার্থী ও শিক্ষার্থীরা এই ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করে প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

বৌদ্ধধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলোর বেশিরভাগ অতি প্রাচীন। এগুলো দীর্ঘকাল অদৃশ্য ছিল। মাটি খনন করে আবিস্কার করা হয়েছে এসব স্থান। এতে প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন রয়েছে। তাই ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো–

ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

ঐতিহাসিক স্থান বলতে আমরা প্রাচীন কালের গুরুত্বসম্পন্ন স্থানসমূহকে বুঝি। এগুলো আমাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অংশ। এই ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শনে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এছাড়া পরিদর্শনকারী আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদান ও কীর্তি সম্পর্কে জানতে পারে।

এজন্য প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ অত্যন্ত প্রাচীন। এগুলো সে সময়ের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে।

ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কী লেখো–

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহাসিক স্থান

চিত্র ২৬: মক্কা আল মুকাররামা

চিত্র ২৭: বারাণসী (কাশী)

চিত্র ২৮: বেথেলহেম নগর

আমাদের যেমন ঐতিহাসিক স্থান আছে তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও ধর্মীয় ঐতিহাসিক স্থান আছে। যেমন; ইসলামধর্ম অনুসারীদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থানগুলোর মধ্যে 'মক্কা আল মুকাররামা', 'মদিনা শরীফ' এবং 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' অন্যতম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে ভারতে 'গয়া', 'কাশী', 'বৃন্দাবন', বাংলাদেশে 'চন্দ্রনাথ ধাম', 'আদিনাথ মন্দির', বারুদীর 'লোকনাথ বাবার আশ্রম' ইত্যাদি। খ্রীষ্টধর্ম অনুসারীদের ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে 'পবিত্র ভূমি', 'গেথসেম্যানের উদ্যান', 'বেথেলহেম' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমাদের প্রত্যেকে প্রত্যেক ধর্মের ঐতিহাসিক স্থানগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিৎ।

একক বা দলগতভাবে আলোচনা করে প্রত্যেক ধর্মের পবিত্র ও ঐতিহাসিক স্থানগুলোর নাম লেখো–

বৌদ্ধধর্ম	ইসলামধর্ম	হিন্দুধর্ম	খ্রীষ্টধর্ম

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই:

১। পূজা শব্দের অর্থ কী?
ক) সেবা খ) শ্রদ্ধা গ) সম্মান ঘ) দীক্ষা

২। তক্ষশীলা কোথায় অবস্থিত?
ক) বাংলাদেশ খ) ভারত গ) পাকিস্তান ঘ) শ্রীলংকা

৩। বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম কী?
ক) বুদ্ধ পূর্ণিমা খ) আষাঢ়ী পুর্ণিমা গ) মধু পূর্ণিমা ঘ) প্রবারণা পূর্ণিমা

৪। সিদ্ধার্থ গৌতম নগর ভ্রমণে গিয়ে কী উপলব্ধি করেন ?
ক) জীবন আনন্দময় খ) জীবন দুঃখময় গ) জীবন উপভোগের ঘ) জীবন সুখের

৫। পূজা করলে মন-।
ক) চঞ্চল হয় খ) অস্থির হয় গ) বিক্ষিপ্ত হয় ঘ) পবিত্র ও শান্ত হয়

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি:

১। দেববংশের চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব _____ বিহার নির্মাণ করেন।

২। একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে _____ করা উচিত।

৩। সকল ধর্মের লোক একসাথে বসবাস করলে সমাজ _____ শিখরে আরোহণ করে।

৪। প্রত্যেক ধর্মের ঐতিহাসিক স্থানগুলোর প্রতি _____ থাকা উচিত।

৫। 'বড়দিন'_____ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব।

গ) মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। পূজা করলে ত্রিরত্নের প্রতি	ক) গৃহত্যাগ করেন।
২। আমাদের সকলের উচিত	খ) মন প্রসন্ন হয়।
৩। বুদ্ধের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো	গ) আষাঢ়ী পূর্ণিমায়।
৪। সিদ্ধার্থ দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য	ঘ) কোন না কোন পূর্ণিমার সঙ্গে জড়িত।
৫। সিদ্ধার্থ মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন	ঙ) সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান বজায় রাখা।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। বুদ্ধ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। জাতিসংঘ বুদ্ধ পূর্ণিমাকে "বেসাখ ডে" হিসেবে ঘোষণা করেছে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। পাহাড়পুর একটি ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ হিসেবে স্বীকৃত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। নালন্দা মহাবিহার নেপালে অবস্থিত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। শালবন বিহার কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। পালি ভাষায় 'আহার পূজার' গাথাটি লেখো।

২। বৈশাখী পূর্ণিমাকে কেন বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বলা হয়?

৩। সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগের কারণ লেখো।

৪। অন্য ধর্মের প্রতি তোমার আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

৫। নালন্দায় কী কী বিষয়ে শিক্ষা দান করা হতো?

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। আহার পূজার নিয়মাবলি লেখো।

২। আষাঢ়ী পূর্ণিমার গুরুত্ব বর্ণনা করো।

৩। ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের উপকারিতা ব্যাখ্যা করো।

৪। পানীয় পূজার উৎসর্গ গাথা পালি ও বাংলায় লেখো।

৫। ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতকে জীব ও প্রকৃতি

এ অধ্যায়ে যা আছে -

- জাতক পরিচিতি
- জাতক অংশ ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা
- শশক জাতক, কুরঙ্গামৃগ জাতক, কপোত জাতক
- জাতকের আলোকে জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্ব

জাতক পরিচিতি

তোমরা জানো যে, ভালো কাজ সর্বদাই প্রশংসনীয়। পৃথিবীতে অনেক রকম ভালো কাজ আছে। সেগুলোর মধ্যে পরের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য যে কাজ করা হয় সে কাজের গুরুত্ব সর্বাধিক। ভালো কাজ যিনি করেন তিনি সকলের প্রিয় ও সম্মানের পাত্র হন। মানুষ তাঁকে কখনো ভোলে না। ভালো কাজ করলে নিজেও সুখী হয়, অপরেরও মঙ্গল হয়। এমনকি এক জন্মের ভালো কাজের সুফল পরের জন্মেও লাভ করা যায়। মানুষ জন্মগ্রহণ করে যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করে। আবার জন্মগ্রহণ করে। এভাবে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে। যতদিন নিজেকে বিশুদ্ধ করতে না পারে ততদিন এরূপ জন্মগ্রহণ করতে হয়। বিশুদ্ধ হওয়া মানে চিন্তায়, কাজে ও আচরণে সর্বোত্তম হওয়া। এরূপ বারবার জন্মগ্রহণ করাকে জন্মান্তর বলে। মহামানব গৌতমবুদ্ধও এক জন্মে বুদ্ধ হননি। তিনি অনেক বার জন্মগ্রহণ করেছেন। একেক জন্মে তাঁর একেক পরিচয় ছিল। এ সময় তিনি বোধিসত্ত্ব নামে পরিচিত ছিলেন। তখন তিনি অনেক ভালো ও কল্যাণকর কাজ করেছেন। তাঁর জন্মান্তরের অনেক কাহিনি আছে। এগুলোকে জাতক বলে। জাতক থেকে আমরা অনেক নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির শিক্ষা লাভ করতে পারি। আবার জাতক সম্পর্কে অনেকের অনেক প্রশ্নও আছে। সে রকম একটি ঘটনা তোমাদের বলছি-

নবনী এবং সুকন্যা দুই বোন। তারা প্রায় সন্ধ্যায় তাদের বাড়ির পাশের বৌদ্ধবিহারে বন্দনা করতে যায়। একদিন নবনী বিহারের বড় ভন্তেকে বন্দনা করে অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। সে কী যেন ভাবছে। ভন্তে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল– ভন্তে, বুদ্ধ কি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন?

ভন্তে জানতে চাইল, তোমার কেন এমন মনে হলো?

নবনী বলল – আমার ঠাকুরমা বলেছেন, বুদ্ধ নানারূপে প্রাণিদের উপকার করতেন। সে বিষয়ে আমাকে অনেক গল্পও বলেছেন। আবার পূর্বের শ্রেণিতে আমরা এমন গল্পও পড়েছি। যেগুলোকে জাতক বলে।

ভন্তে বললেন– হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। বুদ্ধ সিদ্ধার্থরূপে জন্ম নেবার পূর্বে তিনি ৫৪৯বার বিভিন্নরূপে জন্ম নিয়েছিলেন।

পাশে বসা সুকন্যা বলল–তখনো কি তিনি বুদ্ধ ছিলেন?

তখন ভন্তে বললেন, পূর্ব জন্মে তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের এ অতীত জীবনকে বোধিসত্ত্ব জীবন বলা হয়। 'বোধি' শব্দের অর্থ জ্ঞান এবং 'সত্ত্ব' অর্থ প্রাণি বা জীব। যে সত্ত্ব বা ব্যক্তি জ্ঞানের সাধনা করেন তিনি বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্ব বিভিন্ন জন্মে দান, শীল, প্রজ্ঞা, সত্য, মৈত্রী ইত্যাদি পারমী পূর্ণ করে ৫৫০তম জন্মে বুদ্ধ হয়ে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। আর এই বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনিই জাতক নামে পরিচিত।

ভন্তের কথায় নবনী এবং সুকন্যা সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

উপরের ঘটনা থেকে আমরা জাতকের পরিচিতি পেলাম। তোমরা বিগত শ্রেণিতেও জাতক সম্পর্কে জেনেছ। এছাড়া পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মদেশনা থেকেও বিভিন্ন জাতক ও জাতকের উপদেশ সম্পর্কে জেনে থাকতে পারো। সে অভিজ্ঞতার আলোকে একক বা জোড়ায় বা দলগতভাবে নিচের ছকটি পূরণ করো।

জাতকের নাম	উপদেশ
১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

জাতকের অংশ ও পাঠের প্রয়োজনীয়তা

জাতক কাহিনিগুলো কয়েকটি অংশে বিভক্ত। কাহিনির বর্ণনা ও চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই বিভাজন করা হয়েছে। এ পাঠে আমরা সে সম্পর্কে জানব।

জাতক প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত।

প্রত্যুৎপন্ন বস্তু: বর্তমান কাহিনিকে প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বলে। যা জাতকের প্রথম অংশ বা ভূমিকা বলা যায়। এ অংশে গৌতম বুদ্ধ কোন সময়ে, কার উদ্দেশ্যে, কী উপলক্ষ্যে জাতকটি বলেছিলেন তার বর্ণনা আছে।

অতীত বস্তু: জাতকের দ্বিতীয় অংশ হলো অতীত বস্তু বা অতীত কাহিনি। এ অংশে গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

সমবধান: সমবধান বা সমাধান জাতকের তৃতীয় অংশের নাম। জাতকের মধ্যে অতীত কাহিনিতে বর্ণিত চরিত্রগুলোর সঙ্গে বর্তমান কাহিনিতে বর্ণিত চরিত্রগুলোর অভিন্নতা প্রদর্শন বা সম্পর্ক স্থাপন করা হয় এই অংশে।

জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

আমরা প্রত্যেকেই নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভিক্ষুদের দেশনা থেকে বা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে কোনো না কোনো সময় জাতকের গল্প ও উপদেশ শুনেছি। সেই উপদেশ আমাদের জীবনযাপন সৎ ও সুন্দর করতে সাহায্য করেছে। এসো আজ তা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করার চেষ্টা করি।

এরপর শিক্ষক বললেন, আমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি জাতক পড়লে আমরা অনেক বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারব। জাতকে সহজ ভাষায় দশ পারমী এবং পারমী পূরণের প্রভাব বা ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। তাই জাতক ও জাতকের উপদেশ পাঠ করে সাধারণ মানুষ নিজ জীবনে তা প্রয়োগ করতে উৎসাহিত হবে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ জাতক। জাতকের প্রধান লক্ষ্য হলো প্রত্যেককে তার নিজের কর্মের ফল সম্পর্কে অবহিত করা। সাধারণত সৎ কাজের সুফল ও অসৎ কাজের কুফল বর্ণনা করাই এর উদ্দেশ্য। তাই সাধারণ মানুষের জীবনে জাতক নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এছাড়াও জাতকের শিক্ষা মানুষকে পরোপকারী, সহনশীল, ত্যাগী ও সহানুভূতিশীল হতে সাহায্য করে। ফলে জাতকের উপদেশ অনুসরণ করলে কুশল কর্ম সম্পাদন এবং নৈতিক ও মানবিক জীবন যাপনে উৎসাহ পাওয়া যায়। সুতরাং জাতকের শিক্ষা সবার জন্য। নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনে জাতক পাঠ করা একান্ত উচিত।

শশক জাতক, কুরঙ্গমৃগ জাতক, কপোত জাতক

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এখনো সুকণ্যা, নবনী, ও নুথোয়াই উঠানে খেলা করছে দেখে সুকণ্যার ঠাকুরমা ডেকে বললেন, বন্দনা করার সময় হয়েছে, তোমরা হাত-মুখ ধুয়ে এসো।

কিন্তু তাদের বন্ধু নুথোয়াই আজ খেলতে এসেছে তাই তারা এখন আসবে না বলে দিলো। ঠাকুরমা তখন বুদ্ধি করে বলল, আজ বন্দনা ও পঞ্চশীল প্রার্থনার পর তোমাদের গল্প শোনাব।

আর তখনই তারা গল্প শোনার জন্য তৈরি হয়ে গেল। নবনী পঞ্চশীল প্রার্থনা না করে গল্প শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। ঠাকুরমা বললেন, সবাইকে অবশ্যই পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র শীল পালনের মাধ্যমে সবাই ভালো থাকতে পারে।

একথা শোনার পর থেকেই নুথোয়াইর মনে প্রশ্ন, শীল পালন করা কি এত সহজ? সে সুকণ্যার ঠাকুরমার কাছে তা জানতে চাইল।

সুকণ্যার ঠাকুরমা বললেন, আমরা যদি চাই তবে অবশ্যই সম্ভব। বুদ্ধ সেজন্যই তো আমাদের জন্য এ নিয়মগুলো পালন করতে বলেছেন। আর এটা যে শুধু আমাকে ভালো রাখবে তা নয় সমাজে সম্মান অর্জন করতেও সাহায্য করে। এরপর সুকণ্যার ঠাকুরমা সকলের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত জাতকের গল্পগুলো বলা শুরু করল।

শশক জাতক

গৌতম বুদ্ধ জেতবন বিহারে যখন অবস্থান করছিলেন তখন শ্রাবস্তীর এক ভূস্বামী (জমিদার, শ্রেষ্ঠী) দান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে বুদ্ধসহ পাঁচশ ভিক্ষুকে সাতদিন উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দান করেন। সপ্তম দিনে বুদ্ধ সকলের উদ্দেশ্যে দান বিষয়ে শিক্ষণীয় শশক জাতকটি বলেন।

প্রাচীনকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শশক (খরগোশ) কুলে জন্মগ্রহণ করেন। শশকরূপী বোধিসত্ত্ব যেখানে বাস করতেন তার একদিকে বন, অপরদিকে পর্বত এবং অন্যদিকে একটি গ্রাম ছিল। সেই বনে বোধিসত্ত্বের তিন বন্ধু ছিল। বন্ধুরা হলো মর্কট বা বানর, শৃগাল ও উদ্বিড়াল বা ভোঁদড়। এই বুদ্ধিমান ও পন্ডিত চার প্রাণি একসঙ্গে বনে বাস করত। সারাদিন বনে ঘুরে ঘুরে খাবার খেয়ে সন্ধ্যায় তারা নির্দিষ্ট একটি স্থানে মিলিত হতো। তখন শশকপন্ডিত তিন বন্ধুকে সবসময় উপদেশ দিতেন এই বলে যে, 'দান করা উচিত, শীল পালন করা উচিত এবং উপোসথ পালন করা উচিত।' তারাও শশকের এ উপদেশগুলো মেনে চলত।

এভাবে বহুদিন পার হলো। একদিন বোধিসত্ত্ব আকাশে পূর্ণ চাঁদ দেখে বুঝতে পারল পরদিন পূর্ণিমা এবং উপোসথ পালন করতে হবে। তখন তিনি তিন বন্ধুকে ডেকে বললেন, 'আগামীকাল উপোসথের দিন। তোমরা তিনজনেই উপোসথব্রত পালন করবে। কারণ শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দান করলে মহাফল লাভ করা যায়। তাই যদি কোনো ব্যক্তি এসে খাবার প্রার্থনা করে তবে তোমার খাবারের অংশ থেকে তাকে খেতে দেবে।' সকলে সম্মতি দিয়ে নিজ নিজ বাসগুল্মে অর্থাৎ বাস করার ঝোপে চলে গেল।

পরদিন সকাল হওয়ামাত্র উদ্বিড়াল খাবারের খোঁজে গঙ্গার পাড়ে গেল। সেখানে এক জেলে সাতটি মাছ লতা দিয়ে বেঁধে বালি দিয়ে ঢেকে রেখে আরও মাছ ধরার জন্য নদীর অন্যদিকে গিয়েছিল। উদ্বিড়াল মাছের গন্ধ শুঁকে মাছগুলো খুঁজে বের করল। তারপর উচ্চস্বরে তিনবার জিজ্ঞাসা করল, 'মাছগুলো কার'। কিন্তু কেউ যখন মাছগুলো নিজের বলে দাবি করল না তখন সে নিজের কাছে এনে রাখল। তারপর খাবার সময় হলে খাবে এই চিন্তা করে শুয়ে পড়লো এবং শুয়ে শুয়ে সে যে শীল গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগল।

শৃগালও খাবারের খোঁজে বের হয়ে দেখল এক বাড়িতে মাংস ও এক পাত্র দই রয়েছে। তখন শৃগাল 'এ দ্রব্যগুলো কার' তা তিনবার উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিলো না। তখন শৃগাল দ্রব্যগুলো নিজের গুল্মে বা ঝোপের মধ্যে এনে রাখল। কিন্তু তখনো আহারের সময় হয়নি বলে 'বেলা হলে খাব' এই ভেবে সে শুয়ে শুয়ে শীলচিন্তা করতে লাগল। মর্কটও বনে গিয়ে আম জোগাড় করল। তারপর আমগুলো নিজের বাসগুল্মে নিয়ে গেল এবং 'বেলা হলে খাব' এই প্রতিজ্ঞা করে শুয়ে শুয়ে শীলচিন্তা করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব ঠিক করলেন যথাসময়ে বনে চরতে গিয়ে দর্ভতৃণ বা দূর্বাঘাস খাবেন। তিনি নিজের গুল্মে থেকেই চিন্তা করলেন, আমার নিকট যদি কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আসেন তবে তাকে খাবার জন্য শুধু তৃণ দিলে চলবে না। কিন্তু অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্যও নেই। তাহলে কেউ যদি আসে তাকে নিজের শরীরের মাংস পুড়িয়ে খেতে দেব।

বোধিসত্ত্বের এ প্রতিজ্ঞা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে পরীক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মণ সেজে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তিনি মর্কট, শৃগাল ও উদ্বিড়ালের কাছে গেলেন এবং তাদের কাছে খাবার খেতে চাইলেন। তাদের দান গ্রহণ করা শেষে তিনি শশকপন্ডিতের কাছে গেলেন। শশক ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, 'ব্রাহ্মণ আপনি আহারের জন্য আমার কাছে এসে উত্তম কাজ করেছেন। আজ আমি আপনাকে এমন দান করব যা পূর্বে কেউ কখনো দান করেনি। আপনি শীলবান, প্রাণিহত্যা করবেন না। তাই আপনি কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করুন। আমি সেই জ্বলন্ত আগুনে নিজেকে উৎসর্গ করব। আমার শরীর সিদ্ধ হলে আপনি সেই মাংস খেয়ে শ্রামণ্যধর্ম পালন করবেন।'

চিত্র ২৯: ব্রাহ্মণ ও তিন বন্ধুসহ শশক

শশকরূপী বোধিসত্ত্বের কথামতো ইন্দ্র আগুন জ্বালালো। তখন বোধিসত্ত্ব তিনবার গা-ঝাড়া দিলেন, যাতে শরীরে কোনো পোকামাকড় থাকলে পড়ে যায়। তারপর আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু খুব আশ্চর্য বিষয় বোধিসত্ত্বের শরীরে একটুও তাপ লাগল না, একটি লোমও পুড়ল না। তিনি ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্রাহ্মণ! আপনার আগুন এত শীতল কেন?'

ইন্দ্র তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি তোমার চরিত্র পরীক্ষা করতে এসেছি।'

তখন শশক বলল, 'দেবরাজ ইন্দ্র শুধু আপনি কেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাই আমার দান পরীক্ষা করুক, আমাকে কখনো দানবিমুখ দেখবে না।'

ইন্দ্র বললেন, 'শশকপন্ডিত, তোমার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক।' এই বলে দেবরাজ ইন্দ্র নিজ

অবস্থানে চলে গেলেন। আর বোধিসত্ত্ব ও তার বন্ধুরা সম্প্রীতির সঙ্গে সুখে শীল পালন ও উপোসথব্রত পালন করতে লাগল।

এ জাতকে আনন্দ ছিলেন উদ্বিড়াল, মৌদ্গাল্যায়ন ছিলেন সেই শৃগাল, সারিপুত্র ছিলেন মর্কট এবং বুদ্ধ ছিলেন শশকপন্ডিত।

উপদেশ: শীলবান ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।

শশক জাতক পড়ে আমরা জেনেছি শশক, মর্কট, শৃগাল ও উদ্বিড়াল উপোসথ শীল পালন করেছে। তাঁদের মধ্যে কার শীল পালনের ঘটনা তোমার ভালো লেগেছে, কেন ভালো লেগেছে? তা দলে আলোচনা করো। প্রত্যেকের মতামত আলাদাভাবে উপস্থাপন করো–

কুরঙ্গমৃগ জাতক

বুদ্ধ বেনুবন বিহারে অবস্থানকালে এ জাতকের কাহিনিটি বলেছিলেন।

প্রাচীনকালে বারাণসীর রাজা যখন ব্রহ্মদত্ত ছিলেন তখন বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগ বা হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একটি সরোবরের পাশে ঝোপের মাঝে বোধিসত্ত্ব বাস করতেন। আর ঐ সরোবরের কাছাকাছি এক গাছের আগায় এক শতপত্র বা বক/শুক পাখি এবং সরোবরের জলে এক কচ্ছপ বাস করত। এ তিন প্রাণির মাঝে গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

একদিন এক শিকারি বনে শিকারের খোঁজে এসে বোধিসত্ত্বকে দেখতে পেল। তারপর তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সরোবরের ঘাটে ফাঁদ পেতে রাখে। রাতে যখন বোধিসত্ত্ব জলপান করতে গেলেন তখন ফাঁদে আটকে গেলেন এবং চিৎকার শুরু করেন। তার চিৎকার শুনে গাছের উপর থেকে শতপত্র এবং জল থেকে কচ্ছপ এসে উপস্থিত হলো। কী করা উচিত তা ভাবতে ভাবতে শতপত্র কচ্ছপকে বলল, ‘বন্ধু, তোমার দাঁত দিয়ে তুমি এ ফাঁদটি ছিঁড়ে ফেলো। আর আমি শিকারী যাতে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করি। আশা করি আমরা এভাবে চেষ্টা করলে বন্ধুর জীবন রক্ষা করতে পারবো।’

শতপত্রের পরামর্শমতো কচ্ছপ কাজ শুরু করে দিলো। আর শতপত্র উড়ে গিয়ে শিকারির ঘরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলো। শিকারি যখন দরজা দিয়ে বের হতে গেল তখনই শতপত্র চিৎকার করে পাখা ঝাপটাতে শুরু করে দিলো এবং শিকারির মুখে আঘাত করতে লাগল।

চিত্র ৩১: শিকারি ও বোধিসত্ত্ব

শিকারি ভাবতে লাগল, কোনো কুলক্ষণা পাখি মুখে আঘাত করেছে। তাই সে ঘরে ফিরে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে আবার বের হতে গেলে শতপত্র আবার আঘাত করতে লাগল। শিকারি এবারও ভাবল, এ কুলক্ষণা পাখি দেখছি আজ আমাকে বের হতে দেবে না। সে ফিরে গিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করে বের হলো। এবার শতপত্র দ্রুতবেগে উড়ে গিয়ে বোধিসত্ত্বকে শিকারি আসার খবর দিলো। তখন শুধু একটি রশি কাটা বাকি ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ জাল কাটতে গিয়ে কচ্ছপের দাঁতে এমন ব্যথা হয়েছিল যে তার মুখ রক্তাক্ত হয়েছিল। বোধিসত্ত্ব দেখল, অত্যন্ত দ্রুতবেগে শিকারি ধেয়ে আসছে। তিনি তখন সকল শক্তি দিয়ে রশিটি ছিঁড়ে বনে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু কচ্ছপ দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে কোথাও যেতে পারল না। শিকারির হাতে ধরা পড়লো এবং তাকে একটি থলেতে ভরে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল।

বোধিসত্ত্ব কচ্ছপ ধরা পড়েছে দেখে প্রতিজ্ঞা করল, সে তার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করবে। তাই সে খুব দুর্বল এমন ভান করে বনের দিকে যেতে লাগলেন যাতে শিকারি দেখতে পায়। শিকারিও তাকে দেখতে পেয়ে ভাবল, 'হরিণ তো খুব দুর্বল হয়ে গেছে , তাকে সহজে ধরতে পারব।' এই ভেবে সে হরিণকে অনুসরণ করল। বোধিসত্ত্বও সামান্য দূরত্ব রেখে যেতে যেতে শিকারিকে গভীর বনে নিয়ে গেলো। একসময় তাকে লুকিয়ে অন্যপথে দ্রুতগতিতে কচ্ছপের কাছে পৌঁছে গেলো এবং তাকে মুক্ত করলো। এরমধ্যে গাছের মগডাল থেকে শতপত্রও নেমে এল। তখন বোধিসত্ত্ব দুই বন্ধুকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সাহায্যে আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। তোমরা আমার প্রকৃত বন্ধুর মতো কাজ করেছ। তোমরা এখন আর এখানে থেকো না, এখনই শিকারি চলে আসবে। শতপত্র তুমি তোমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাও। আর কচ্ছপ তুমি ভাই তাড়াতাড়ি জলে নেমে যাও।' এভাবে বোধিসত্ত্ব ও তার দুই বন্ধু শিকারির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেছিলেন।

এখানে দেবদত্ত ছিলেন সেই ব্যাধ, সারিপুত্র ছিলেন শতপত্র, মৌদ্গাল্যায়ন ছিলেন কচ্ছপ এবং বুদ্ধ ছিলেন কুরঙ্গমৃগ।

উপদেশ: একতাই বল।

এ জাতক পাঠে তোমরা জেনেছ একতাই বল। একত্রে কাজ করলে অনেক প্রতিবন্ধকতা জয় করা যায়। তোমার জানা এমন কোনো ঘটনা কি আছে যা একসঙ্গে করেছ এবং জয়ী হয়েছ। সে ঘটনা বা ঘটনাগুলো দলে আলোচনা করো এবং প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা নিচে উপস্থাপন করো।

কপোত জাতক

বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থানকালে একজন লোভী ভিক্ষুকে উদ্দেশ করে এ জাতকটি বলেছিলেন।

প্রাচীনকালে বারাণসীর রাজা যখন ব্রহ্মদত্ত ছিলেন তখন বোধিসত্ত্ব পারাবত বা কবুতররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন বারাণসীবাসীরা পাখিদের সুবিধা ও আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে খড় দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করে ঝুলিয়ে রাখত। বারাণসীর প্রধান শ্রেষ্ঠীর পাচকও রন্ধনশালায় এরূপ একটি ঝুড়ি রেখেছিলেন। বোধিসত্ত্ব সে ঝুড়িতে বাস করতেন। প্রতিদিন ভোরে তিনি খাবারের খোঁজে চলে যেতেন এবং সন্ধ্যায় ফিরে এসে ঝুড়ির ভেতর শুয়ে থাকতেন। একদিন এক কাক ঐ রন্ধনশালার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় মাছ-মাংসের গন্ধ পেয়ে তার খাওয়ার লোভ হলো। কীভাবে এ ইচ্ছে পূরণ হবে তা বসে ভাবতে লাগল। এমন সময় সন্ধ্যায় দেখতে পেল বোধিসত্ত্ব রন্ধনশালায় প্রবেশ করছেন। তখন কাকটি ঠিক করল এ কবুতরের মাধ্যমে তার ইচ্ছে পূরণ করবে।

পরদিন ভোরে কাক রান্নাঘরের কাছে উপস্থিত হলো। বোধিসত্ত্ব যখন খাবারের সন্ধানে বের হলো তখন কাক তার পিছু নিলো। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চললে কেন?'

কাক বলল, 'আপনার চালচলন আমার বড়ো ভালো লেগেছে। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে আপনার অনুচর হয়ে থাকবো।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'দেখো, আমার খাদ্য ও তোমার খাদ্য এক রকম নয়। আমার অনুচর হলে তোমার অসুবিধা হবে।'

কাক বলল, 'প্রভু, আপনি যখন আপনার খাদ্য অন্বেষণ করবেন, আমি তখন আমার খাদ্য অন্বেষণ করব এবং সারাক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকবো।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বেশ তা হোক, কিন্তু তোমাকে খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে।'

এভাবে কাককে সতর্ক করে দিয়ে বোধিসত্ত্ব মাঠে বিচরণ করে তৃণবীজ খেতে লাগলেন। আর কাকও কীটপতঙ্গ খেয়ে খেয়ে পেট ভরে বোধিসত্ত্বকে এসে বলল, 'আপনি অনেকক্ষণ ধরে ভোজন করছেন, অতিভোজন করা ভালো নয়।'

এরপর বোধিসত্ত্বের খাওয়া শেষ হলে যখন সন্ধ্যার সময় বাসার দিকে চলল, কাকও তখন তাঁকে অনুসরণ করল এবং রান্নাঘরে প্রবেশ করল। পাচক তখন বোধিসত্ত্বের সঙ্গে কাককে দেখে তার জন্য আরেকটি ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিলো। তারপর তারা একসঙ্গে বাস করতে লাগল। একদিন শ্রেষ্ঠী অনেক মাছ-মাংস আনলেন। তা দেখে কাকের খুব লোভ হলো। সে ঠিক করল পরদিন সে খাবার খুঁজতে যাবে না। সারাদিন রান্নাঘরে থাকবে এবং এ মাছ-মাংস খাবে। এই ভেবে সে সারারাত অসুস্থতার ভান করে কাটাল। ভোর হলে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'চলো বন্ধু, খাবারের সন্ধানে যাই।'

কাক বলল, 'না প্রভু, আজ আপনি একাই যান। আমার পেটে ব্যথা হয়েছে।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'কাকের যে কুক্ষিরোগ হয় তা কখনো শুনিনি। তুমি নিশ্চয়ই মাছ-মাংস খাওয়ার লোভে পড়েছো। তুমি আমার সঙ্গে চলো। এভাবে লোভ কোরো না, চলো আমার সঙ্গে গিয়ে খাবার খুঁজে খাবে।'

কাক বলল, 'না প্রভু, আমার চলার সাধ্য নাই।'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'ঠিক আছে তোমার আচরণেই তোমার উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে সাবধান, কোনো অসঙ্গত কাজ করবে না।'

কাককে এ উপদেশ দিয়ে বোধিসত্ত্ব নিজের খাবার সংগ্রহে চলে গেলেন। এদিকে পাচক রান্না করে গরম বাষ্প বের হওয়ার জন্য পাত্রের ঢাকনা সামান্য খোলা রেখে বাইরে শরীরের ঘাম মুছতে গেল। কাকও ঠিক এ সময় ঝুড়ি থেকে বের হয়ে এক টুকরো মাংস নিয়ে ঝুড়িতে বসে খাবে এই ভেবে যেই মাংস নিতে গেল অমনি উড়ে গিয়ে মাংসের গরম ঝোলের মধ্যে পড়লো। কাকের শরীরে লেগে ঢাকনা পড়ে গিয়ে ঝনঝন শব্দ করে উঠল। শব্দ শুনে পাচক ছুটে এসে কাককে দেখতে পেল। রেগে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কাককে ধরতে গিয়ে দেখে প্রচণ্ড গরম ঝোলে সে ডুবে গেছে। পাচক তাকে সেখান থেকে তুলল এবং ঝুড়িতে ফেলে রাখল। ব্যথায় কাকটি চিৎকার করতে লাগল। সন্ধ্যায় বোধিসত্ত্ব এসে কাকের এ দুরবস্থা দেখে ভাবতে লাগলেন, 'লোভী কাক আমার কথা না শুনে মহাদুঃখ পেয়েছে।'

বোধিসত্ত্বের এখানে থাকা উচিত হবে না, এই ভেবে স্থান ত্যাগ করলেন। আর কাক সেখানেই মারা গেল। পাচক ঝুড়িসহ কাকটিকে আবর্জনার মাঝে ফেলে দিলো।

এ জাতকে জেতবনের এক লোভী ভিক্ষু ছিলেন কাক এবং বুদ্ধ ছিলেন বোধিসত্ত্বরূপী পারাবত বা কবুতর।

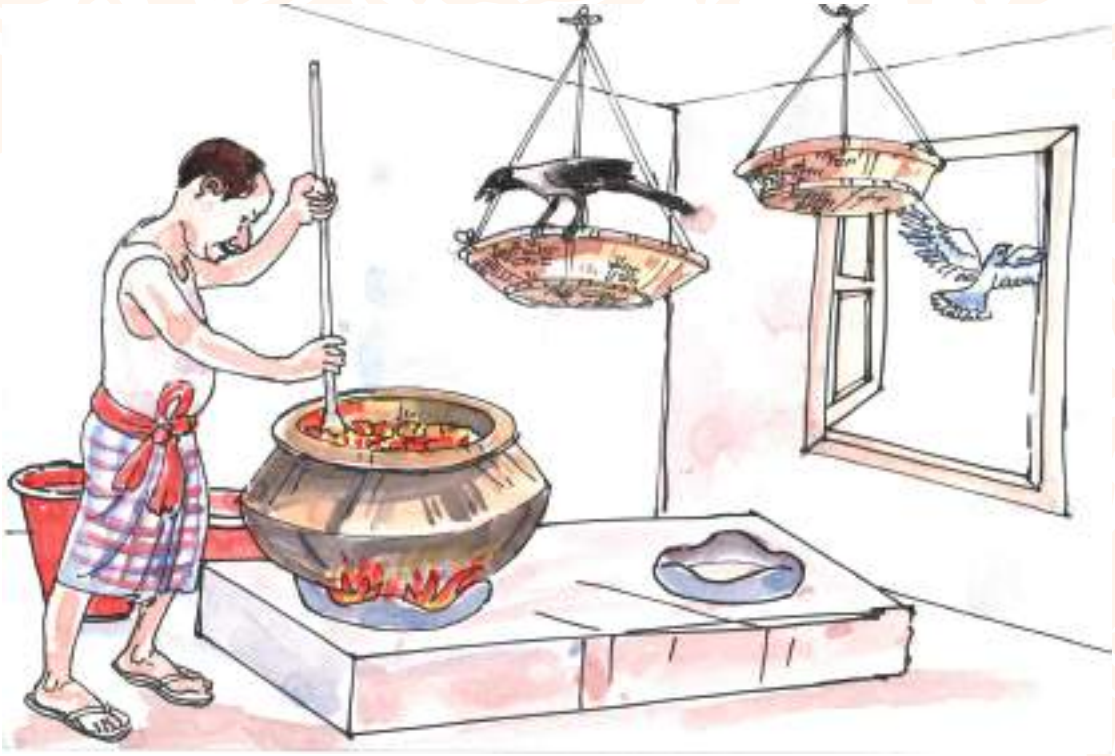

চিত্র ৩০: কাক ও কপোত

উপদেশ: লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

কপোত জাতক পড়ে তোমার যে অনুভূতি হয়েছে তা লেখো–

জাতকের কাহিনিগুলোতে যে সমস্ত ভালো বিষয় প্রকাশ পেয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করো–

জাতকের আলোকে জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্ব

জীবজগত বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল উদ্ভিদ, অনুজীব ও প্রাণি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সমস্ত জীব এবং তারা যে পরিবেশে টিকে থাকে এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বৈচিত্র্যই হলো জীববৈচিত্র্য। প্রাণিদের মধ্যে এ বৈচিত্র্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন: মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা ইত্যাদি। সহজ করে বলা যায়, যদি একটি পুকুরে নানান প্রজাতির মাছ থাকে তাহলে সে পুকুর হবে জীববৈচিত্র্যময়। অনুরূপভাবে একটি দেশে যদি বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মানুষ বসবাস করে থাকে তাহলেই সেটি হবে বৈচিত্র্যময় দেশ। প্রাণি ও প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পূর্ণরূপে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতি থেকে আমরা প্রায় সবকিছুই পেয়ে থাকি। খাবার, আসবাবপত্র, ঘরবাড়ি, জ্বালানি, ঔষধ প্রভৃতি প্রকৃতির উপাদান থেকে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া জীব বৈচিত্র্য জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়, খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করে। তাই আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সুরক্ষিত হলে মানুষ উপকৃত হবে।

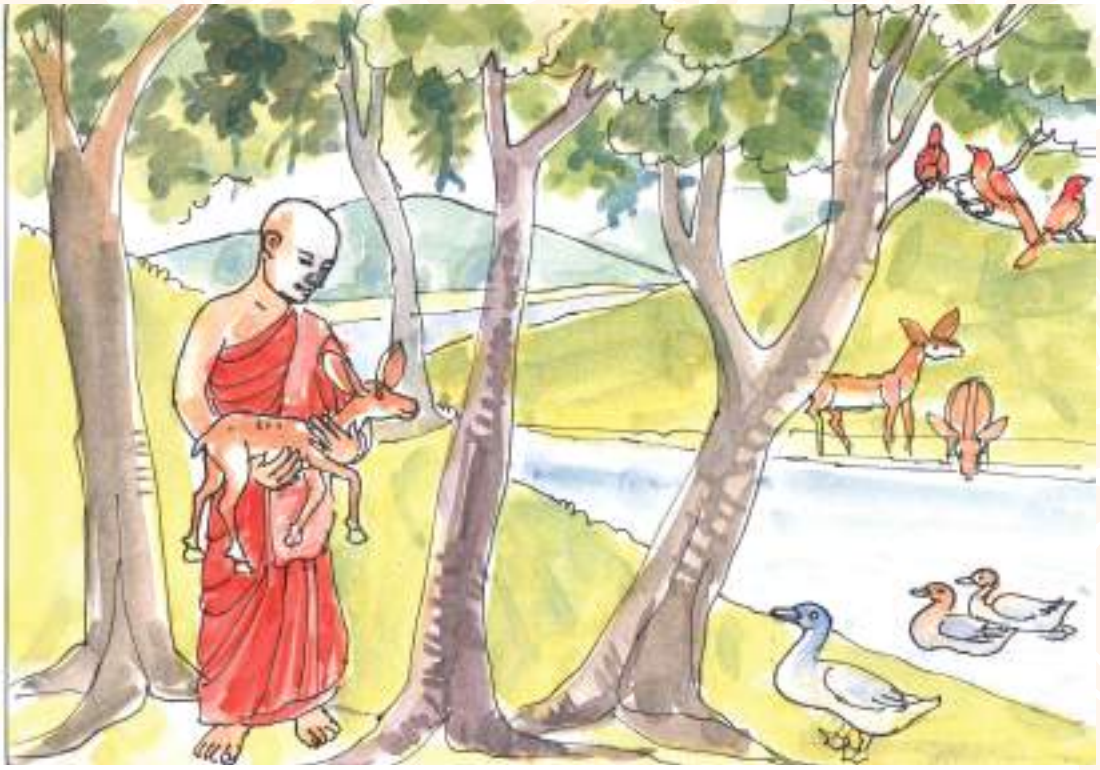

চিত্র ৩২: প্রকৃতি ও জীব

বুদ্ধের জীবনীতে ও বুদ্ধের নিজ মুখে বলা নানা কাহিনিতে প্রাণি ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। শশক, কপোত এবং কুরঙ্গামৃগ জাতক পাঠে আমরা প্রকৃতি ও জীবজগত সুরক্ষায় আমাদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। শশক জাতক পাঠে আমরা জানতে পারি যে, অন্যায়ভাবে এবং বিনা কারণে কোনো প্রাণিকে আঘাত ও হত্যা না করে আমরা ভালভাবে জীবনযাপন করতে পারি। পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য নানা জাতির প্রাণির বেঁচে থাকার যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা আমরা এ জাতক পাঠে জানতে পারি। কুরঙ্গামৃগ জাতক আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, একতাবদ্ধভাবে একে অপরের সহযোগী হয়ে বসবাস করলে পরিবার ও সমাজ সুরক্ষিত থাকে। নানান প্রতিকূলতা পারস্পরিক সহযোগিতায় অনায়াসে মোকাবেলা করা যায়। এ জাতক পাঠে আরো জানা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিকুল একে অপরের পরিপূরক হয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে টিকিয়ে রাখে। কপোত জাতক হতে আমরা জানতে পারি, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীর উপকরণ প্রকৃতির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। সে উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করলে কখনো জীবন ধারণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু মানুষের লোভের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হয়। ফলে মানুষের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। জাতক আমাদেরকে জগতে বিরাজমান বড়-ছোট সকল প্রাণিকে সুখে ও শান্তিতে রাখতে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করতে শিক্ষা দেয়। তাই জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের একান্ত উচিত।

তোমাদের বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ কেমন তা পাঁচটি বাক্যে লেখো–

তোমরা কীভাবে বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ আরও ভালো করতে পারো তা লেখো–

অনুশীলনী

ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিই:

১। ভালো কাজ সর্বদাই -।
ক) প্রশংসনীয় খ) নিন্দনীয় গ) দুঃখজনক ঘ) কষ্টকর।

২। গৌতম বুদ্ধের কোন জীবনকে 'বোধিসত্ত্ব জীবন' বলা হয়?
ক) ভবিষ্যৎ খ) বর্তমান গ) অতীত ঘ) ধর্মীয়।

৩। জাতকের অংশ কয়টি?
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি।

৪। কপোত জাতকে মাছ-মাংসের গন্ধ পেয়ে কাকের কী উৎপন্ন হলো?
ক) দ্বেষ খ) হিংসা গ) লোভ ঘ) ঘৃণা।

৫। তুমি লোভের ফল কী মনে করো?
ক) পাপ খ) ভালো গ) উত্তম ঘ) পুণ্য।

খ) শূন্যস্থান পূরণ করি:

১। বিশুদ্ধ হওয়া মানে চিন্তায়, কাজে ও আচরণে _____ হওয়া।

২। জাতকে _____ পূরণের প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে।

৩। জাতক ত্রিপিটকের _____ নিকায়ের গ্রন্থ।

৪। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে _____ করলে মহাফল লাভ করা যায়।

৫। শীলবান ব্যক্তিরা সর্বত্র _____ হয়।

গ) মিল করি:

বাম পাশ	ডান পাশ
১। জাতক থেকে আমরা	ক) বুদ্ধত্ব লাভ করেন।
২। বোধিসত্ত্ব বিভিন্ন জন্মে পারমী পূর্ণ করে	খ) বিভিন্ন প্রাণি উপকৃত হবে।
৩। জাতকের গল্প ও উপদেশ	গ) নৈতিক ও মানবিক শিক্ষা পাই।
৪। জাতকের প্রধান লক্ষ্য হলো	ঘ) আমাদের জীবনযাপন সৎ ও সুন্দর করে।
৫। পরিবেশ ও প্রকৃতি সুরক্ষিত হলে	ঙ) প্রত্যেককে নিজের কর্মের ফল অবহিত করা।

ঘ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নির্ণয় করি:

১। জাতকের উপদেশ আমাদের সৎ জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

২। বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনি নিয়েই জাতক রচিত। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৩। জাতকের প্রথম অংশ হলো প্রত্যুৎপন্ন বস্তু। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৪। শীল পালনের মাধ্যমেই সবাই ভালো থাকতে পারে। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

৫। শশক জাতকের বিষয়বস্তু হলো ধ্যান। শুদ্ধ/অশুদ্ধ

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। জাতক কী?

২। কুরঙ্গমৃগ জাতকে তিন বন্ধুর পরিচয় দাও।

৩। শশক জাতকে শশক তিন বন্ধুকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

৪। একত্রে কাজ করলে কী কী বাধা জয় করা যায় সংক্ষেপে লেখো।

৫। কপোত জাতকের শিক্ষা তুমি কীভাবে অনুসরণ করবে লেখো।

চ) বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

১। কপোত জাতকের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো।

২। দেবরাজ ইন্দ্র কীভাবে শশক পন্ডিতের পরীক্ষা নিলেন?

৩। জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করো।

৪। কুরঙ্গমৃগ জাতকের আলোকে তুমি কীভাবে তোমার বন্ধুদের বিপদ থেকে রক্ষা করবে?

৫। জাতকের আলোকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য, চতুর্থ শ্রেণি–বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সকল প্রকার পাপকর্ম হতে বিরত থাকবে।

– গৌতম বুদ্ধ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য